যাত্রাপথ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BANGLAPDF.COM

তারা চার জন সাইকেলে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। সুভদ্র, অমিত, দীপঙ্কর আর তীর্থঙ্কর। তিনজনের যাত্রা অব্যাহত আছে। পড়ে আছে অমিত। কলকাতা থেকে যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন তাদের ক্লাব থেকে একটা বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল ঘটা করে। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ফটো তোলা হয়েছিল। একজন এমপি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতের যুবসমাজকে দুঃসাহসিক অভিযানে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি অনেকগুলো বাক্য ব্যয় করেন। ফ্ল্যাগ অফ করার পর যখন চারজন সত্যিই যাত্রা শুরু করেছিল তখন স্বস্তিবোধ করেছিল অমিত। পাশাপাশি সে আর সুভদ্র। একটু পিছনে দীপু তার তীর্থঙ্কর, ওরা খুব বন্ধু। অমিত বলল, এসব বিদায় সংবর্ধনার কোন মানে হয়?

সুভদ্র বুদ্ধিমান এবং টিমের ক্যাপ্টেন। বলল, মানে একটু হয়। আমরা যাচ্ছি পাবলিকের চাঁদার টাকায়। আমরা যে সত্যিই যাচ্ছি তার একটা প্রমাণ থাকা দরকার।

অমিত কথাটার জবাব দিতে পারল না। তবে সে লক্ষ্য করেছে, খবর দেয়া সত্ত্বেও টিভির ক্যামেরাম্যান আসেনি। আসেনি খবরের কাগজের কোন লোকও। বেহালার একটি অখ্যাত ক্লাবের চারজন সদস্যের এই অভিযানকে গুরুত্ব দেয়ার কথাও নয় তাদের। তাহলে প্রচারটাই বা হবে কি করে? প্রচার মাধ্যমই যে অনুপস্থিত!

দিল্লি রোড ধরে তাদের প্রথম উত্তর ভারতের দিকে যাওয়ার কথা। বেশ যাচ্ছিল তারা, ঘটনাবিহীন মসৃণ গতিতে, একটু আগুপিছু হয়ে। সাইকেলের পিছনে মস্ত ব্যাগ, সামনের হ্যান্ডেলেও আর একটা ব্যাগ, প্রয়োজনীয় জিনিসের বহর তো কম নয়, ভাড়া করা স্লিপিং ব্যাগ থেকে শুরু করে ওষুধ-বিষুধ অবধি।

বর্ধমান পর্যন্ত চমৎকার চলে এল তারা, এখানে নাইট হল্ট। হোটেলে থাকার মত বাড়তি পয়সা তাদের নেই। যা টাকা আছে তাতে খুব হিসাব করে না চললে অভিযান মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হবে। বর্ধমানে সুভদ্রর কাকা থাকেন। তার বাড়িতেই রাত্রিবাস। এরপর রানিগঞ্জ, যশিডি এবং পাটনায় তাদের এরকমই আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। বাদবাকি হল্ট-এ রাত্রিবাস করতে হবে। পলিথিনের তাঁবুতে বা স্পিনিং ব্যাগে। যদি অবশ্য আশ্রয় না মেলে। ঘোর অনিশ্চয়তা। আর যে কোন অভিযানের আসল মজাই তো এখানে। অনিশ্চয়তা না থাকলে মজাই বা কি?

অমিতকে অবশ্য অনিশ্চয়তার সন্ধান করতে হয় না। অনিশ্চয়তাই তাকে খোঁজে। অমিত ঘরের অনেকগুলো সোফার একটাতে বসতে যাচ্ছিল, সুভদ্র চাপা গলায় বলল, কাকার সামনে আমরা বসি না, বসতে বললে বসবি।

অমিত বুঝে গেল লোকটার প্রচণ্ড দাপট।

প্রায় মিনিট পনের অপেক্ষা করার পর কাকার সময় হলো। একে একে তিন জন আগন্তুককে হেড টু ফুট খুব খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। হঠাৎ অমিতের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কি করো?

অমিত অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমি?

সুভদ্র তাড়াতাড়ি বলল, কিছু করে না কাকা, বেকার।

কাকা অসন্তুষ্ট হয়ে কঠোর গলায় বললেন, ওকে বলতে দাও, তোমাকে তো জিজ্ঞেস করিনি। অমিত একটু ভয় পেয়ে ঢোক গিলে বলল, কিছু না।

কাকা সবাইকে ছেড়ে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ও, ঠিক আছে, যাও তোমরা ডিনার সেরে বিশ্রাম কর।

অমিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এ বাড়ির ব্যবস্থা এলাহি। ঠাণ্ডা আর গরম জলের ট্যাপ, নতুন সাবান, ধবধবে সাদা তোয়ালে। ডিনার টেবিলে থরে থরে খাবার সাজানো। মুরগি, বিরিয়ানি, পায়েস, সবজি। তবে সার্ভ করল সব চাকরবাকর শ্রেণীর লোক। যদিও তারা খুবই ধোপদুরস্ত এবং যথেষ্ট বিনয়ী, তবু বাড়ির লোক তো নয়।

অমিত একবার চাপা স্বরে বলল, তোর কাকীমা নেই?

আছে।

তাকে তো দেখলাম না।

উনি একটু অন্যরকম।

কেমন, সেটা আর জিজ্ঞেস করল না অমিত।

তীর্থঙ্কর আর দীপঙ্করও এ বাড়ির ঐশ্বর্য আর জাঁকজমক দেখে একটু ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তারা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সুভদ্রর কাকা যে এত বড় লোক তা তাদের জানা ছিল না।

তীর্থঙ্কর বলল, মাইরি কেমন ভয় ভয় করছে।

সুভদ্র মৃদু হেসে বলে, ভয়ের কি, এক রাত্রির তো ব্যাপার। ভাল করে খা।

তার বাপ-মা নেই। ছেলেবেলাতেই সব ফৌত হয়েছে। তার উপর তারা উদ্বাস্তু। এই বাংলায় তাদের ঘরবাড়ি নেই। কিংবা বলা ভাল, এক উদ্বাস্তু পল্লীতে তাদের দুখানা ঘর আর জবরদখল আড়াইকাঠা জমি ছিল। সেটা বহুকাল বেহাত হয়েছে। শিশুকাল থেকেই সাত-আট ঘাটে জল খেতে হয়েছে তাকে। এক পয়সাওয়ালা মামা তাকে আশ্রয় না দিলেও মাসে মাসে ত্রিশটা করে টাকা দিতেন। অমিত ঠিকাদারের কুলি থেকে শুরু করে পুরুতগিরি সবই করেছে। লেখাপড়াটা তেমন হল না। তবে ভাগ্যক্রমে সে একটা মোটর গ্যারেজে কিছুদিন কাজ করেছিল। সেই বিদ্যে ভাঙিয়েই এখন খায়। বেহালার ওই ক্লাবখানাই তার আশ্রয়। ক্লাবের সেক্রেটারি বলাইবাবু করুণাপরবশ হয়ে আশ্রয়টির ব্যবস্থা করেছেন। সে ক্লাবে থাকে, ঝাড়পোছ করে।

পড়ার একটা গ্যারেজে সে কাজ করে। অবসর সময়ে ক্লাবের লাইব্রেরির অজস্র বই পড়ে। পড়ার সুবিধেও আছে। সে লাইব্রেরির ঘরেই রাত্রিবেলা শোয়। এক পাড়াতুতো বিধবা মাসিমার কাছে মাসিক বন্দোবস্ত দু'বেলা খেয়ে আসে।

কলকজার ব্যাপারে তার মাথা আছে। এটা সে জানে। সে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেত তাহলে ফাটিয়ে দিত। কিন্তু কপাল খারাপ।

আবার অন্য দিকে তার কপাল ভালই বলতে হবে। ক্লাবের শিক্ষিত এবং ভাল ঘরের যুবকদের সঙ্গে তার দিব্যি ভাব-সাব । যে কোনও কাজেই তাকে পাড়ার প্রয়োজন হয়। ডাক্তার ডাকা, শ্মশানে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা কাজেই অমিতের ডাক পড়ে। অম্লানবদনে অমিত ফ্যাক খাটে। তার কোনও অহংকারবোধ নেই। আপনার জন নেই। পিছুটান নেই।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সে বেশ আছে। আবার নেইও। পাড়ার ক্লাবের অস্থায়ী আবাসে থাকা এবং পাঁচ জনের কাজ করে বেড়ানোটা একটা ভাসমানতা। স্থায়ী ও গভীর নয় এরকম বেঁচে থাকা। এভাবে নিজেকে অনুভবও করা যায় না।

সুভদ্রর কাকার বাড়িতে যখন তারা পৌঁছালো তখন বেশ রাত হয়েছে। কাকা রামমোহন রাশভারী লোক। চারজন যাবে, খবর দেয়া ছিল। হা-ক্লান্ত তারা যখন সাইকেল থেকে নেমে মস্ত চওড়া মার্বেল-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বিশাল বৈঠকখানায় কাকার মুখোমুখি হলো তখন কাকা তার সেক্রেটারিকে কী একটা ডিকটেশন দিচ্ছেন। তাদের দিকে একবার তাকালেন, কিন্তু ডিকটেশন দেওয়া বন্ধ করলেন না।

অমিতের খিদে প্রচণ্ড, সে ভাল করেই খাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কে জানে কেন, গলা দিয়ে খাবারগুলো তেমন নামল না। কয়েক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে খিদেটা আরও মরে গেল, তার পর এল অনিচ্ছে।

খাওয়ার চেয়েও তাদের বেশি দরকার ছিল ঘুম।

শোয়ার ব্যবস্থাও বাড়ির অন্যান্য ব্যাপারে মতো মানানসই। বিশাল একখানা ঘরে চার কোনে চারটি মহার্ঘ্য খাট। সাদা চাদর পাতা টানটান, নীল রঙের মশারি ফেলা, পায়ের কাছে ভাঁজ করা লেপ।

তারা পট পট লেপের তলায় ঢুকে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হল না। সকালেই ফের যাত্রা।

কিন্তু লেপের তলায় ঢোকার পরই একটা অদ্ভুত শারীরিক অনুভূতি হতে লাগল অমিতের। তার প্রচণ্ড শীত করছে হঠাৎ। শরীর থরথর করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

অমিতের অসুখ-টসুক বড় একটা করে না। তার শরীর বিশেষ রকমের মজবুত। কাজেই সে একটু ভয় খেয়ে গেল। এরকম হচ্ছে কেন?

উঠে সে ফের জল খেল। কিন্তু বুঝতে পারল, তার টেম্পারেচার বাড়ছে। শ্বাস বেশ গরম, নাড়ি দ্রুত চলছে। মাথাটা ঘোর ঘোর লাগছে। সে প্রাণপণে দুহাত মুঠো করে বালিশে মাথা গুঁজে শক্ত হয়ে রইল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না।

জ্বরের ঘোরে তার কেবলই মনে হাচ্ছিল, সুভদ্রর কাকা চার জনের মধ্যে বেছে বেছে তাকেই কেন জিজ্ঞেস করলেন, সে কী করে। উনি কি তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে, এই চারজনের মধ্যে সেই সবচেয়ে গরীব এবং আলাদা শ্রেণীর? ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছে। তিন জনেরই গভীর ঘুমের দ্রুত শ্বাসের শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ অমিত জ্বরের ঘোরের মধ্যে দেখতে পেল, তার চোখের সোজাসুজি ঘরে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে।

একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল অমিত। এত রাতে ঘরে কে ঢুকছে? নিশ্চয়ই চোর নয়। এ বাড়িতে তিন-চারটে বাঘা কুকুর আছে। বেশ কয়েক জন দারোয়ান আছে। যে ঢুকল তাকে দেখে চমকে উঠল অমিত। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা। গায়ে একটা কালো শাল। মুখখানা দারুণ সুন্দর। ভদ্রমহিলা খুব ফর্সাও।

ঢুকেই চারদিকে চাইলেন। চারজনকেই দেখলেন। অমিতের দিকে চাইতেই অমিত চোখ বুজে ফেলল।

কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ বুজেও থাকতে পারল না সে। খুব সাবধানে আবার চোখ খুলে সে দেখতে পেল তার পায়ের দিকে যে মস্ত লোহার আলমারিটা রয়েছে, ভদ্রমহিলা সেটা খুলছেন। আলমারিটা জাতে নিশ্চয়ই খুব ভাল এবং কব্জায় নিয়মিত তেল-টেল দেওয়া হয়। কারণ পাল্লা খোলার কোনও শব্দ হল না, শুধু চাবির একটা মৃদু শব্দ ছাড়া।

কি যেন বের করছেন মহিলা। ইনি বাড়ির মানুষ কিনা তা জানার উপায় নেই। সাড়াশব্দ করাটা উচিৎ হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না অমিত। চুপ করে থাকাটাই তার বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো।

কিছু একটা বের করে নিয়ে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। যাওয়ার সময় দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে যেতে ভুললেন না। অমিত উঠলো। ব্যাগপ্যাক খুলে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বের করে খেলো। সঙ্গে খেলো একটা ট্রাংকুই লাইজার। পারতপক্ষে সে ওষুধ খায় না, কিন্তু অন্যের বাড়িতে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াটা তার কাছে অস্বস্তিকর।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওষুধের ক্রিয়া বুঝতে পারছিল সে। জ্বর নেমে যাচ্ছে, শীত ভাবটা কেটে গেছে এবং ঘুম পাচ্ছে। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গলো তার, অস্বস্তিতে। প্যারাসিটামলের ক্রিয়া কেটে গেছে। তার ফের প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। ভয়ের কথা হল, পেটে প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করছে সে। জ্বর নিয়ে টলতে টলতে সে বাথরুমে গেল এবং বুঝতে পারল তার পেটের গণ্ডগোলও শুরু হয়েছে।

তিনবার বাথরুম ঘুরে আসার পর সে সুভদ্রকে ডেকে তুলল, আমার ভীষণ জ্বর এসেছে। কি হবে বলতো!

সুভদ্র তার গা দেখে বলল, এতো হাই টেম্পাচার দেখছি। দাঁড়া থার্মোমিটার দিয়ে দেখি।

থার্মোমিটারে একশ চার উঠলো। সুভদ্র ভ্রূ কুঁচকে বলল, কোয়াইট হাই।

উদ্বিগ্ন অমিত বলে, তা হলে কি হবে?

তোকে বেড রেস্ট নিতে হবে। ডাক্তার দেখাতে হবে।

মাথা নেড়ে অমিত বলল, আমাদের ট্যুরটার কি হবে? আমি যেতে পারবো না?

পাগল নাকি? এই জ্বর নিয়ে যাবি কোথায়?

করুণ গলায় অমিত বলে, তোরা তাহলে চলে যা। আমি কলকাতায় ফিরে যাই।

ফিরবিই বা কি করে? জ্বরের সঙ্গে ডায়রিয়া আছে। ফেরা সহজ নয়। আগে ডাক্তার দেখাই। তারপর ডিসিশন নেয়া যাবে। হঠাৎ এটা হল কি করে।

বুঝতে পারছি না। সারাদিন তো ভালই ছিলাম। এতটা রাস্তা সাইকেল চালিয়ে এলাম। হঠাৎ রাত্রিবেলা টের পেলাম টেম্পারেচার।

সুভদ্র তীর্থ আর দীপুকে ঘুম থেকে তুলে বলল, আমাদের জরুরী বৈঠক আছে। অমিত সিক। কি করা যাবে?

সব শুনেটুনে দীপু বলল, লক্ষণটা টাইফয়েডের। তবে ভাইরাস ফিবারও হতে পারে। তোর ঠাণ্ডা লাগেনি তো অমিত?

না।

তাহলে কেসটা একটু সিরিয়াস। টুর ক্যানসেল করতে হবে।

অমিত বলল, আমার টুর তো অটোমেটিক্যালি ক্যানসেলড।

আমি আমাদের টুরের কথাও বলছি।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, না, তোরা যা।

দীপু নিজে ডাক্তারি পড়ে। তার বাবাও বেহালার নামকরা ডাক্তার। সে একটু ভেবে বলল, আমাদের দু'চারদিন অপেক্ষা করতে বাধা নেই। তোকে ঠেসে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যদি খাড়া করা যায় তাহলে খুব অসুবিধে হবে না। কিন্তু এন্টেরিক ফিবার হলে মুশকিল। চট করে কেউই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না।

অমিত আরও দু'বার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বলল, হোপলেস। শোন সুভদ্র, আমাকে যদি থেকেই যেতে হয় তাহলে অন্তত হাসপাতালে পৌঁছে দে। এ বাড়িতে তো থাকা চলবে না। অসুখ হয়েছে বলে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। বাড়ির লোক যেন জানতে না পারে।

সুভদ্র ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। বলল, কাকা বড়লোক বটে, কিন্তু মানুষ খারাপ নয়। তোর লজ্জার কোনও কারণ নেই। ডাক্তার তো ডাকতেই হবে।

এই বলে সুভদ্র বেরিয়ে গেল।

অমিত শারীরিক অস্বস্তির সঙ্গে প্রবল মানসিক অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগল। সে গরিব-দুঃখী মানুষ। জীবনে কখনও আরাম বিলাসে থাকেনি। পাড়ার লাইব্রেরির টেবিলে সে শোয়, পরের বাড়িতে খায়, সারাদিন তেল-

কালি মেখে গাড়ি মেরামত করে। সে এক কথায় নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষ। এই বিশাল বড়লোকের বাড়িতে তার থাকাটা হবে বড়ই লজ্জাজনক।

দীপু, আমি কিন্তু কিছুতেই এ বাড়িতে থাকতে পারব না। তোরা আমার অন্য একটা ব্যবস্থা করে দে।

দীপু দাঁত ব্রাশ করছিল। বলল, অত অস্থির হচ্ছিস কেন? আগে ডাক্তার এসে দেখুক, তারপর ভাবা যাবে। অনেক সময়ে পেটে গ্যাস হয়ে জ্বর হয়। সেটা হলে ভয়ের কিছু নেই।

মিনিট পনেরো বাদে সুভদ্র একটু বিবর্ণ মুখে ফিরে এল। এসে বলল, একটু ঝামেলা হয়েছে। আমার মনে হয় অমিতকে হাসপাতালেই যেতে হবে।

তীর্থ ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করছিল। দীপু গেছে মুখ ধুতে। অমিত চোখ বুজে পড়ে ছিল। চোখ খুলে উদ্বেগের গলায় বলল, কী হয়েছে?

ভাবছি বলাটা উচিত হবে কিনা!

আমি যে টেনশনে আছি। বলবি না?

সুভদ্র চিন্তিত মুখে বলে, এ বাড়িতে বউ-পালানোর একটা পুরনো ট্রাডিশন আছে। কাকার প্রথম বউ অর্থাৎ আমার কাকিমা পালিয়ে গেছে অনেকদিন আগে। কাকার ছেলে মলয়ের বউ তো ফুলশয্যার দু'দিন বাদেই চলে যায়। কাল রাতে কাকার সেকেন্ড ওয়াইফ অর্থাৎ আমার নতুন কাকিমাও নাকি চলে গেছেন। কাকা তো রেগে আগুন।

অমিত উত্তেজনায় উঠে বসে বলল, কাল অনেক রাতে এ ঘরে একজন মহিলা এসেছিলেন, মধ্যবয়স্কা। আলমারি থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে গেলেন। তিনিই কি?

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলল, কাকিমার বয়স কম। বাইশ-টাইশ হবে। মধ্যবয়স্কা যাকে দেখেছিস সে বোধহয় কাকার শাশুড়ি। এরা কাকাকে খুব এক্সপ্লয়েট করছিল। মলয়দা তো মাতাল মানুষ, খুব ইমপ্র্যাকটিক্যাল। তাকে এরা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না। তবে শুনেছি, নতুন কাকিমা আর তার মা এ বাড়িতেই থানা গেড়ে বসে নানা কাণ্ড করছে। কাকাকে চাপ দিয়ে নাকি অনেক বিষয়-সম্পত্তি কাকিমার নামে লিখিয়েও নিয়েছে। পিছনে শাশুড়িটি আছে। ভদ্র মহিলা নাকি ক্যাবারে-ট্যাবারেতে নাচ-গান করত, বাইজি টাইপের। ব্যাড ক্যারেকটার।

তীর্থ ব্যায়াম শেষ করে বলল, তাহলে পালাল কেন? এখানে থেকেই তো আরও এক্সপ্লয়েট করতে পারত।

সুভদ্র ম্লানমুখে বলে, বোধহয় কাকা একটু টাইট দিয়েছিল। ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, আর এক্সপ্লয়েট করা যাবে না। তবে যা পেয়েছে তাও কম নয়। কাকার তিনটে কোল্ডস্টোরেজের মধ্যে দু'টোই কাকিমার নামে। একটা ভিডিও পারলার, চালকল, সবই হাতিয়ে নিয়েছে।

তীর্থ বিছানায় বসে অবাক হয়ে বলল, তোর কাকা তো বোকা লোক নয়। তাকে এক্সপ্লয়েট করল কি করে?

সুভদ্র ঠোঁট উল্টে বলে, তা কে জানে। ভদ্রমহিলা দারুণ চালাক। ব্ল্যাকমেল-এর ব্যাপারও থাকতে পারে।

তোর নতুন কাকিমা কেমন মানুষ?

জানি না, একবার দেখেছিলাম। দেখতে বেশ ভালই। তবে কাকার সঙ্গে তো মানায় না। কাকার বয়স এখন চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন হবে। মনে হয় বিয়েটা একটা চালাকি। কাকার টাকা-পয়সা হাতানোর কৌশল।

তীর্থ হতাশ হয়ে বলে, তাহলে তো বেজায় গণ্ডগোল। এ বাড়িতে আজ ব্রেকফাস্টও জুটবে না। রুগী নিয়ে পড়া গেছে, তারই বা কি হবে?

সুভদ্র মৃদু হেসে বলে, না না, হাউসহোল্ড ঠিকই চলছে। এ বাড়িতে একজন সংসার দেখা-শোনার লোক আছে। হরিপদদা। সেই সব ঠাকুর-চাকরকে চালায়। ওসব নিয়ে চিন্তা নেই। আর অমিতের ডাক্তারও এল বলে। খবর চলে গেছে। সবই ঠিক আছে, শুধু আমাদের যাত্রাভঙ্গ করতে হচ্ছে। আর কাকার মেজাজটা ভাল

নেই।

তার ছেলে কোথায়?

মলয়দা? সে তো আউট হাউসে থাকে। অনেক রাতে ফেরে, বেলা অবধি ঘুমোয়। সে কাকার সঙ্গে সম্পর্কই রাখে না।

অমিত ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, আমাদের কপালটাই খারাপ।

দীপু বাথরুম থেকে বেরিয়ে সব শুনল। তারপর বলল, এ তো বোম্বাই ছবির গল্প।

ক্যাবারে ড্যান্সারের মেয়ে, ব্ল্যাকমেল, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। দারুণ ব্যাপার। তবে তোর কাকাকে অবশ্য বুড়ো বলে মনে হয় না। বেশ ফিট চেহারা।

সুভদ্র একটা শ্বাস ফেলে বলল, এখনও ব্যায়ামট্যায়াম করেন। যোগ অভ্যাস আছে।

দীপু তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বলল, গল্প জমে গেছে।

এদের বাড়ির সবকিছুই বড্ড উঁচুদরের। যে ডাক্তার অমিতকে দেখতে এলেন তিনি একজন বিলেতফেরত এবং এমআরসিপি। সুভদ্র চাপা গলায় বলল, ইনি ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। ভিজিট দু'শো টাকা।

অমিত মিনমিন করে বলল, এত টাকা দিলে আমাদের থাকবে কি?

দূর বোকা, কাকার বাড়িতে আমরা টাকা শো করলে কাকার কি প্রেস্টিজ থাকবে?

ডাক্তার বাবুর বয়স ত্রিশের কোঠায়।

চেহারাটা সুন্দর এবং হাসিখুশি।

অমিতকে পরীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন, ভয়ের কিছু নেই। তবে ভোগাবে।

অমিত করুণ গলায় বলল, কিন্তু আমরা যে সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছি।

ডাক্তার বাবু হাসলেন, ভ্রমণটা আপাতত বিছানায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আমার সাজেশন হল, বন্ধুরা চলে যাক। আপনি রেস্ট নিন।

সুভদ্র বলল, তা হয় না। আমরা চারজন বেরিয়েছি একসঙ্গে।

অমিত বলল, খুব হয়। তুইই তো পাবলিক মানির কথা বলছিলি। যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের ঠকানো হবে।

সুভদ্র বলল, ওর কী হয়েছে ডাক্তার বাবু?

মনে তো হচ্ছে এন্টেরিক ফিবার। তবে সাত-আট দিন না গেলে বোঝা যাবে না। আপাতত অ্যান্টিবায়োটিক আর অন্য ওষুধ চলবে।

প্রেসক্রিপশন লিখে ডাক্তার বাবু চলে গেলেন। তারপর চারজনের আবার মিটিং বসল।

সুভদ্র বলল, অমিতকে এই অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানোই হয়তো উচিত। কিন্তু সেখানে কেমন ব্যবস্থা তা জানি না। ওকে হাসপাতালে দিতে আমার ইচ্ছেও করছে না।

দীপু আর তীর্থ প্রায় একই নিশ্বাসে বলল, হাসপাতাল অতি জঘন্য জায়গা। মেরে ফেলবে।

তাহলে?

তিনজন ফের মিটিং করতে লাগল। অমিত টের পেল তার জ্বর আরও বাড়ছে। শরীর ঝিমঝিম করছে। পেটের

মধ্যে কলকল শব্দ। সে চোখ বুজল এবং একটা ঝিমুনি বা তন্দ্রার মধ্যে ডুবে গেল।

চোখ যখন মেলল তখন তাকে ঘিরে কয়েকজন লোক। একজন সুভদ্রর কাকা। বউ পালিয়ে যাওয়ার শকটা যেন ভদ্রলোক কাটিয়ে উঠেছেন। মুখ একটু গম্ভীর, এই যা।

কাকাই প্রশ্ন করলেন, কেমন আছো?

আজ্ঞে ভাল।

জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে। ভাল কি করে আছো?

অমিত শুষ্ক মুখে বলল, কলকাতায় ফিরে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

কাকা মৃদু একটু হাসলেন, কলকাতাতেই বা তোমার দেখা-শোনা কে করবে? সুভদ্রর কাছে শুনলাম তুমি নাকি লাইব্রেরিতে থাকো। আত্মীয়-স্বজনও তো নেই।

অমিত সভয়ে ঢোঁক গিলে বলে, পাড়ার সবাই আমাকে চেনে। কোনও অসুবিধে হবে না।

কাকা একটু প্রগাঢ় গলায় বললেন, লজ্জা পেও না হে। অসুখ তো কেউ সাধ করে বাধায় না। তুমি জলেও পড়োনি। আমি বলি, তুমি এখানেই থাকো। আমাদের একটা সিক রুম আছে, সেখানে সব ব্যবস্থাই করা থাকে। উঠে হেঁটে যেতে পারবে? নইলে ধরাধরি করে নিতে হবে।

অমিত তার প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও টপ করে উঠে পড়ল। বলল, পারব।

সে উঠতেই আরও দুজন লোক এগিয়ে এসে তাকে দু'ধার থেকে ধরে ফেলল। এ বাড়ির কাজের লোকই হবে। একজন বলল, চলুন, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

কাকা বললেন, সুভদ্ররা তোমার ওষুধ আনতে গেল। এসে যাবে।

সিক-রুমটা একতলায়। মূল বাড়ি থেকে একটু তফাতে, কিন্তু লম্বা ঢাকা করিডোর দিয়ে যোগাযোগ করা রয়েছে। লাগোয়া বাথরুম। ঘরে হাসপাতালের বেডের মতই ব্যবস্থা। ওষুধের ক্যাবিনেট, ড্রিপ দেওয়ার স্ট্যান্ড, অকসিজেন সিলিন্ডার, জল গরম করার ইলেকট্রিক হিটার সব আছে।

কাকা তার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। বললেন, থাকতে পারবে এখানে?

অমিত কাতর স্বরে বলল, আমার জন্য কেন কষ্ট করছেন কাকা?

কষ্ট! কষ্ট কিসের? এ ঘর তো ফাঁকাই থাকে। শুয়ে পড়ো, কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না। নার্স এলে মাথা ধুইয়ে, গা স্পঞ্জ করে দেবে।

নার্স! বলে এমন হ্যাঁ করে রইল অমিত যে মুখে একটা চড়াইপাখি ঢুকে যেতে পারে।

হ্যাঁ। এসে পড়বে। জাস্ট গো টু স্লিপ।

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। স্প্রিং দেওয়া জালের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই। নার্স আসবে শুনে আতঙ্কে খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলো অমিত। কিন্তু জ্বরটা এমন তুঙ্গে চড়ে আছে যে, সে বেশিক্ষণ চেতন থাকতে পারছে না। বড় জ্বরও একটা নেশার মতোই। সে ফের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

যখন ফের জাগল তখনও নার্স আসেনি। সে বাথরুমে যেতে এবং আসতে গিয়ে বুঝতে পারছিল, সে টলছে। চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছে। একটু হাঁপাচ্ছেও।

সুভদ্র, দীপু আর তীর্থ এল দুপুরের দিকে। সুভদ্রর হাতে ওষুধ। বলল, নে, ক্যাপসুলটা খা।

অমিত করুণ স্বরে বলল, তোর কাকা আমাকে এখানেই থাকতে বলেছে।

সুভদ্র গম্ভীর হয়ে বলল, জানি। এরচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হয় না।

শুনছি নার্স আসবে।

এ বাড়ির ওটাই নিয়ম।

তীর্থ একটু শিস দিয়ে বলে, নার্স! কেমন নার্স? ইয়ং অ্যান্ড বিউটিফুল নয় তো!

দীপু বলল, নার্সের সঙ্গে রোগীর প্রেম কিন্তু একটা কমন ব্যাপার।

অমিত রেগে গিয়ে বলে, গুলী মার প্রেমের। নার্স এসে নাকি মাথা ধোয়াবে, গা পোঁছাবে। জন্মে কোনও অনাত্মীয় মহিলাকে ছুঁইনি। এসব আমি পারব না।

সুভদ্র খুব উদাস গলায় বলে, অসুখ হলে মানুষ শিশুর মতো হয়ে যায়। তখন আর লজ্জা কিসের?

ওষুধ খেয়ে ফের তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল অমিত। যখন ঘুম ভাঙল তখন অল্পবয়সী একটি মেয়ে একটা থার্মোমিটার চোখের সামনে ধরে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে আছে।

সে চোখ চাইতেই মেয়েটি বলল, জেগেছেন! ভালই হয়েছে। এখনই মাথায় জল ঢালতে হবে।

আপনি কি নার্স?

হ্যাঁ। আমার নাম সুপর্ণা বিশ্বাস। আপনার খুব হাই টেম্পারেচার। কেমন লাগছে বলুন তো!

কেমন তা বুঝতে পারছি না। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। আর মনে হচ্ছে জলে ডুবে আছি। আমার কি হয়েছে?

মনে হচ্ছে টাইফয়েড। একটু ওপর দিকে উঠে শুয়ে পড়ুন তো।

ব্যবস্থা ভালই। ট্যাপ থেকে রবারের নল টেনে বালতির মুখে মাথা ধোয়ানোর বন্দোবস্ত। মেয়েটা প্রায় আধঘণ্টা ধরে তার মাথা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিয়ে তোয়ালেতে মাথা মুছল। কপালে জলপট্টি দিল অডিকোলোন মিশিয়ে। অমিত এত রাজকীয়ভাবে থাকেনি কখনও। কিন্তু মাথা ধোয়ানো ও জলপট্টির ফলে তার শরীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাল লাগতে লাগল।

খুব লজ্জার সঙ্গে সে হঠাৎ বলল, আমার জন্য এত ব্যবস্থা না করলেও চলত।

মেয়েটা ভ্রু কুঁচকে বলল, কেন বলুন তো!

অভ্যাসই নেই। আমি খুব সামান্য মানুষ।

তাই নাকি?

হঠাৎ এসে উটকো ঝামেলা পাকিয়ে দিলাম।

মেয়েটা হাসল। মেয়েটাকে এই প্রথম লক্ষ্য করল অমিত। শ্যামলা, কিন্তু দেখতে খুব মিষ্টি।

ডাক্তার বাবুটি বিকেলের দিকে এলেন। সিরিঞ্জে কিছুটা রক্ত টেনে নিলেন পরীক্ষার জন্য। নিতে নিতেই বললেন, এন্টেরিক ফিবারের জার্ম আট-দশ দিনের আগে পাওয়া যায় না। তবু একটু টেস্ট করানো ভাল।

অমিত করুণ গলায় বলে, আমার কি টাইফয়েডই হয়েছে?

ডাক্তার হাসলেন, সেটাই তো মনে হচ্ছে। রেস্ট নিন আর খুব করে ফুড খান।

আমার যে পেট খারাপ।

ওতে কিছু হবে না। ভাতটাত সব খাবেন। ফুড চার্ট করে দেওয়া আছে। আপনারা একটা সাইকেল ট্যুরে যাচ্ছিলেন, না?

আজ্ঞে হাঁ। আমার যাওয়াটা খুব দরকার ছিল।

রোগের বিরুদ্ধে তো কিছু করার নেই।

অমিত সুগভীর হতাশায় ডুবে গেল।

রাত্রিবেলা যে নার্সটি এলেন তিনি বয়স্কা এং খুবই হাসিখুশী। এসেই বললেন, বেশ রোগটি বাধিয়েছো। আগে এই রোগে মানুষ মারাও যেত। ওষুধ ছিল না। আমার আর আমার ভাইয়ের একসঙ্গে হয়েছিল। আমার ভাইয়ের তো একটা হাত পঙ্গু হয়ে গেল। আমার অবশ্য কিছু হয়নি। তবে প্রায় দু'মাস ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিলাম।

ও বাবা!

ভয় পেও না। এখন টাইফয়েড জলভাত। একটু ভোগান্তি আছে। তবে পনেরো দিনের বেশী নয়।

পনেরো দিন! সেও তো অনেক দিন।

অত ভাবছো কেন? শুয়ে থাকা ছাড়া আর তো কষ্ট কিছু নয়। ইয়ং ম্যান, ভাল স্বাস্থ্য, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে ফেলল অমিত। পরদিন সকালে বন্ধুরা ফের জড়ো হলো বিছানার ধারে।

সুভদ্র একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, অমিত, আমরা ডিসিশন নিতে পারছি না। কী করব বল তো।

তোরা চলে যা। আজই চলে যা, আমার কপালটাই খারাপ, কিন্তু কি করা যাবে?

ভাবছিলাম, যদি মাসখানেক পিছিয়ে দেওয়া যায়।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, তা হয় না। ফেয়ারওয়েল দিয়েছে, ফিরে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে। তোরা যা।

বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করে নিল। তারপর সুভদ্র বলল, দেন দ্যাটস দ্যাট।

আমরা আজই রওনা হচ্ছি।

অমিত কুণ্ঠিত গলায় বলে, তোরা চলে গেলে এখানে থাকতে আমার খুব অস্বস্তি লাগবে।

কেন? এখানে তো তোফা আছিস।

তা আছি। কিন্তু তোর কাকার একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে। ওর নিশ্চয়ই মন ভাল নেই। এই অবস্থায় তার ঘাড়ে চেপে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

সুভদ্র তার দিকে স্থির চোখে একটু চেয়ে থেকে বলল, তোর চিন্তার কিছু নেই। কি জানি কেন, তোকে দেখেই কাকা একটু ইমপ্রেসড। আমাকে বলেছেন, ছেলেটা তো বেশ কাজের বলে মনে হয়। মনে রাখিস, কাকা সহজে কারও প্রশংসা করে না। তোকে কোনও কারণে কাকার বেশ ভাল লেগেছে।

অমিত একটু উজ্জ্বল হয়ে বলে, সত্যি? কাউকে ইমপ্রেস করার কোনও ক্ষমতাই আমার আছে বলে তো মনে হয় না।

তোর ভিতরে কি আছে তা তুই কি করে বুঝবি? আর কাকিমার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমার কাকা হলো এ ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক। এমনিতেই বোধ হয় সম্পর্কটা টিকত না। কানাঘুষো শুনছি, অনেকদিন থেকেই নাকি টাকা-পয়সা আর সোনাদানা সরাচ্ছিল।

অমিত নানা মানসিক কারণে কিছু অস্থিরতা বোধ করছিল। বলল, তবু তোরা আমাকে হাসপাতালে দিলেই ভাল করতিস। যাক গে, আর তো কিছু করার নেই। শুধু ভাবছি, কাকার এই ঋণটা কি করে শোধ করব।

কাকার ঋণ শোধ করার কিছু নেই। তোর জন্য যা খরচ হচ্ছে সেটা কাকার কাছে নস্যিও নয়। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাই।

অমিতের মনটা হঠাৎ খুব খারাপ লাগতে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।

বন্ধুরা চলে গেল তৈরি হতে। এল সুপর্ণা। কেমন আছেন আজ?

করুণ গলায় অমিত বলল, ভাল নেই। ওরা আজ চলে যাচ্ছে। আমি একা পড়ে রইলাম।

সুপর্ণা একটু মায়াভরে হাসল। দাঁতগুলো ঝকঝকে। বলল, ভাবছেন কেন? পরের বার আবার যাবেন।

আর কি এরকম সুযোগ আসবে?

খুব আসবে। এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিন তো।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

করছে না, কিন্তু জোর করে খেতে হবে। আর আজ থেকে টয়লেটে যাওয়ার দরকার নেই। বেডপ্যান নেবেন।

অমিত লাল হয়ে গেল লজ্জায়। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, মাপ করবেন। ওটা পারব না।

আপনি খুব ছেলেমানুষ। এত হাই টেম্পারেচার নিয়ে উঠে দাঁড়ানো বা হাঁটা কত বিপজ্জনক তা জানেন? মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন।

অমিত মৃদুস্বরে বলল, আমাকে খুব কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে। আমার সব কিছু অভ্যাস আছে।

সুপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে অন্তত টয়লেটে গিয়ে ছিটকিনিটা দেবেন না। মনে থাকবে?

ঠিক আছে।

আপনি কিন্তু খুব হেড স্ট্রং।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আপনি তো আমাকে জানেন না। আমি সামান্য মোটর মেকানিক, অনাথ, গরিব। থাকি পাড়ার একটা লাইব্রেরিতে। এত আরামের ব্যবস্থা আমার কল্পনাতেও আসে না।

আপনার সম্পর্কে এ সবই আমি জানি।

অমিত বলল, সেই লাইব্রেরিতে জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে কী হতো বলুন তো! সবই তো নিজের করতে হতো। কিংবা হাসপাতালে যেতে হতো।

আপনি এখানে এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন? রামমোহনবাবুকে আমি চিনি। খুব রাগী আর ব্যক্তিত্ববান মানুষ। সবাই ভয় পায় কিন্তু ওঁর দয়ামায়াও খুব। সারা জেলায় ওঁর মতো দান-ধ্যান খুব কম মানুষের আছে। আর সেজন্যই তো অত হিংসে করে লোকে।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, উনি যে দয়ালু লোক তা বুঝেছি।

ওঁর ছেলেকে চেনেন?

না, পরিচয় হয়নি।

নানা দোষ আছে ঠিকই, কিন্তু খুব উদার। অদ্ভুত ধরনের মানুষ।

সুপর্ণা বিশ্বাসকে অমিতের খুবই পছন্দ হতে লাগল। বেশ চেহারা, সপ্রতিভ, কথাবার্তায় চটপটে, কিন্তু মলয়ের প্রতি ভক্তিটা কি একটু বেশি?

অমিত বলল, আপনি কি হাসপাতালের নার্স?

সুপর্ণা বলল, না তো! আমি রামমোহনবাবুর নার্সিং হোমে কাজ করি, নার্সের ট্রেনিং আছে। যখন দরকার হয় তখন এ বাড়িতে নার্সিং করি। আপনি কিন্তু বড্ড বেশি কথা বলছেন। রুগীদের চুপ করে থাকাই নিয়ম।

আজ কথা না বললে আমার বড় কষ্ট হবে। ওরা এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে। একটু বাদেই ওরা বেরিয়ে পড়বে, কোথায় কোথায় চলে যাবে, আর আমি! এই ঘরে পড়ে থাকব একা। আমার মনটা আজ ভীষণ খারাপ।

খারাপ হওয়ারই কথা। আচ্ছা, বরং গল্পই করা যাক। আমি বলব, আপনি শুনবেন। ঠিক আছে?

তাই হবে।

তার আগে ব্রেকফাস্ট।

আমার যে খিদে নেই।

ভয় নেই, আপনার যা ভাল লাগবে তাই খেতে বলেছেন ডাক্তারবাবু, কী খেতে ইচ্ছে করছে বলুন তো!

কিচ্ছু না।

আচ্ছা, একটু দুধ দিয়ে কর্নফ্লেক খান। তারপর টোস্ট। ঠিক আছে?

কর্নফ্লেক কী জিনিস?

খাননি? ভুট্টা থেকে হয়। খেয়েই দেখুন।

খিদেটা এখন নেই, কিন্তু পরে হয়তো হবে। আপনি তো জানেন না আমার খিদে খুব মারাত্মক।

তাই নাকি?

আমি ভীষণ খাই। বেহালায় এক পাতানো মাসির বাড়িতে খেতে হয় আমাকে। তিনি খুব ভাল মানুষ। যত্ন করে খাওয়ান। আমিও খুব খাই।

সুপর্ণা একটু হেসে বলল, তাই নাকি?

সেই খাওয়াটা একটু দেখিয়ে দিন না।

সুপর্ণা চলে গেল এবং একটু বাদে আবার দুধ কর্নফ্লেক টোস্ট নিয়ে এল ট্রেতে সাজিয়ে।

মোটর মেকানিক অমিত তার স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা ও অস্বস্তির সঙ্গে সেসব খেতে লাগল। তার এখনও দাস্ত হচ্ছে। এই খাওয়া কি তার সহ্য হবে? কে জানে বাবা! মস্ত ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে তার ওপরে তো আর কথা নেই!

তার খাওয়া শেষ হতেই বন্ধুরা এল।

প্রত্যেকের মুখেই একটু দুঃখের ভাব।

সুভদ্র তার হাত চেপে ধরে বলল, তোকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে, কিন্তু বেটার লাক নেক্সট টাইম।

চোখে জল আসছিল অমিতের। কী করতে পারে সে।

তীর্থ আর দীপুও তাকে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল। অমিত ধরা গলায় বলল, সাবধানে যাস।

ওরা রওনা হয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল অমিত। তার যাওয়া হলো না। এরকম সুযোগ আর আসবে কিনা কে জানে। হয়তো আসবে না। সে অনাথ, গরিব, তার সুযোগ আসে অন্যের দয়ায়।

সুপর্ণা ঘরে ছিল না। হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকেই বলল, এ কী! এঃ মা, ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে দেখ! আচ্ছা লোক তো আপনি! পুরুষ মানুষকে একটু শক্ত হতে হয়।

অমিত চোখ খুলে একটু হাসল। বলল, জ্বরটা আমাকে বোধহয় মনের দিক দিয়েও দুর্বল করে ফেলেছে।

চোখটা মুছে ফেলুন। রামমোহনবাবু আপনাকে দেখতে আসছেন।

তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল সুপর্ণাই। বিছানাটা একটু গুছিয়েও দিল দক্ষ হাতে। ঘরে স্প্রে করে একটু

মৃদু সুবাস বা জীবাণুনাশক ছড়িয়ে দিল।

রামমোহনবাবু এলেন। রাশভারী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চেহারা। কে বলবে যে, এর বউ সবেমাত্র পালিয়ে গেছে!

রামমোহন একটা চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসলেন। মনে হলো, শুধু কুশলপ্রশ্ন করতে আসেননি। বললেন, কেমন লাগছে জায়গাটা?

খুব ভাল।

বন্ধুরা চলে গেল মন খারাপ তো!

আজ্ঞে, খুব খারাপ লাগছে। আপনাদেরও অসুবিধেয় ফেললাম।

রামমোহন একটু হেসে বললেন, গরিব হলেই একটা কি হয় জানো, লোকে অকারণে হীনমন্যতায় ভোগে। তোমার জন্য আমাদের কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। ইটস এ বিগ হাউজহোল্ড।

লজ্জিত অমিত চুপ করে রইল।

রামমোহন বললেন, তুমি তো মোটর মেকানিক। আচ্ছা বলতে পারো একটা মাঝারি গ্যারেজের মালিকের মাসে কত টাকা আয় হয়?

গ্যারেজের মালিকরা বেশিরভাগই যা খুশি মজুরি নেয়। কোনও রেট নেই। মোটরগাড়ির মালিকরা বেশিরভাগই অজ্ঞ। সুতরাং লাভ ভালই হয়। চালু গ্যারেজ হলে মাসে দশ পনেরো বিশ হাজারও হতে পারে।

ব্যবসাটা খুব ভাল, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধরো যদি একটা বেশ অল পারপাস বড় গ্যারেজ করা যায় তাহলে?

অল পারপাস মানে?

মানে সব পার্টস পাওয়া যাবে, সব রকম মেরামতি হবে।

একদম এ টু জেড?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনকি সব পার্টস অবধি পাওয়া যাবে। এরকম করা যায় না?

কেন করা যাবে না?

আমাদের এখানে এরকম একটা মোটর গ্যারেজ করলে বোধহয় ভালই চলবে। ট্রাক থেকে শুরু করে ছোটো গাড়ি সব রকম ভেহিকেলের জন্যই ব্যবস্থা থাকবে। এমনকি ব্রেকডাউন গাড়ি তুলে আনার ব্যবস্থাও।

ইনিশিয়ালি অনেক টাকা লাগবে। তবে ভালই হয়।

এখন আমার একটা প্রস্তাব আছে তোমার কাছে।

বলুন।

তোমাকে দেখে আমার খুব সৎ আর পরিশ্রমী বলে মনে হয়। আমি যদি তোমাকে আমার মোটর গ্যারেজের ভার দিই চালাতে পারবে?

খুবই অবাক হলো অমিত। রোগের যন্ত্রণা প্রায় ভুলে গেল সে। বলল, আমাকে! আমাকে তো আপনি ভাল করে চেনেন না।

মানুষ চেনার একটা বিধিদত্ত ক্ষমতা আমার আছে। নইলে এত বড় কারবার করে উঠতে পারতাম না। তবে

আমার আর একটা ব্ল্যাংক দিকও আছে। আমি মানুষ চিনি, কিন্তু মেয়েমানুষ একদম চিনতে পারি না।

অমিত লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

রামমোহন একটু শব্দ করে হাসলেন, ওই একটা জাতের কাছে আমি বারবার হেরে যাই। অনেক নাকাল হয়েও শিক্ষা হলো না।

অমিত চুপ।

রামমোহন বললেন, তোমার মতটা আমাকে এক সময়ে জানিয়ে দিও।

অমিত তাড়াতাড়ি বলল, এর আবার মতামত কী আছে কাকা? আমি খুব রাজী। এ তো আমার সৌভাগ্য।

রামমোহন একটু হেসে বললেন, ভাল-মন্দ বিচার না করেই রাজী হয়ে গেলে?

অমিত করুণ গলায় বলল, আমি সামান্য কাজ করি। আমার যা অবস্থা তার চেয়ে খারাপ তো কিছু হতে পারে না।

রামমোহন একটু গম্ভীর চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার কখনও স্বাধীন ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয়নি?

হয়েছে।

চেষ্টা করেছো?

না। মোটর গ্যারেজ করতে অনেক টাকার দরকার। কিছু টাকা জমাতে পারলে হয়তো করতাম।

শোনো, আমার গ্যারেজটা নিজের গ্যারেজ মনে করেই চালাবে। তোমার সঙ্গে একটা মাসিক লেনদেনের চুক্তি থাকবে। লাভের বাকিটা তোমার।

অমিত একটু ভেবে বলল, হিসেব-নিকেশের ব্যাপার কি আমি ততটা বুঝব? আমি কলকব্জা বুঝি।

রামমোহন দত্ত একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, সেও বটে। বড় কারবার চালাতে অভিজ্ঞতা দরকার। তুমি তো বাচ্চা ছেলে। আচ্ছা প্রথমে মাসিক বেতনেই কাজ শুরু করো। শুধু একটা কথা।

বলুন ।

আমার ছেলের কথা শুনেছো তো!

মলয়বাবু? শুনেছি।

এ পৃথিবীতে শুধু একটা জিনিসের প্রতিই ওর আকর্ষণ দেখি। সেটা হলো মোটর গাড়ি।

মেকানিজমটা ভালই বোঝে। ও দিশী গাড়িকে নানারকম জিনিস ফিট করে অন্যরকম করে তুলতে পারে। খুব মাথা, ওকে তোমার কারবারে ইনভলভড করতে হবে।

কী যে বলেন! আপনার কারখানায় তো আপনার ছেলেরই অধিকার।

ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মলয়কে কোনও কাজে এনগেজ করা খুব শক্ত। এ কাজটা তোমাকে করতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে সাইকোলজিক্যাল ধাঁচ বুঝে সাবধানে করতে হবে।

চেষ্টা করব।

আমার ছেলে হট টেম্পারড, খেয়ালী এবং মাঝে মাঝে অ্যাগ্রেসিভ। যাদের জীবন-সংগ্রাম করতে হয় না, যারা ছেলেবেলা থেকেই যা চায় তাই পায়, যাদের ওড়ানোর মতো যথেষ্ট টাকা এবং সময় থাকে এবং যারা আদরে মানুষ, তারা বেশিরভাগই মানুষ হিসেবে সমাজ এবং পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্যারাসাইট, আমি

মলয়কে পছন্দ করি না, কিন্তু সে আমার ছেলে এবং একমাত্র ওয়ারিশ। সুতরাং যতদিন বাঁচব তার প্রতি আমার কর্তব্য করতেই হবে। ও আমার মুখোমুখি হতে চায় না। হয়তো নানা কারণে আমাকে অপছন্দও করে। তুমি একটু চেষ্টা করো। আমি শুধু একটা জিনিস জানি, গাড়ির ওপর ওর ফ্যাসিনেশন আছে।

জ্বরের ঘোরে এসব কথা শুনছে অমিত।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ভুল শুনছে বা স্বপ্ন দেখছে। বর্ধমান জায়গাটা কি তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট?

রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার টাইফয়েড হয়েছে বলেই ডাক্তারের ধারণা। কোনও চিন্তা নেই, টাইফয়েড আজকাল কোনও অসুখই নয়।

জানি।

তোমার অ্যাডভেঞ্চারটা হলো না, এটা হয়তো দুঃখের ব্যাপার। তবে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

রামমোহন চলে যাওয়ার পর সুপর্ণা তাকে প্যারাসিটামল খাইয়ে মাথা ধুইয়ে দিল।

বলল, দুপুরে গা স্পঞ্জ করে দেবো।

আতঙ্কিত অমিত বলল, তার দরকার নেই।

জ্বরে স্পঞ্জ করা ভাল। ফ্রেশ লাগবে।

আমি বেশ আছি।

না বেশ নেই। ডাক্তারের কথা শুনতে হয়।

অসহায় অমিত বলল, তাহলে আমি নিজেই স্পঞ্জ করে নেবো।

সুপর্ণা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, রুগী হলো শিশুর মতো, লজ্জা পেতে নেই, বুঝলেন?

বুঝতে একটু সময় লাগবে।

সুপর্ণা তার জন্য একটা তরল খাবার তৈরী করে দিয়ে বলল, রামমোহনবাবু আপনাকে বিরাট অফার দিচ্ছেন, তাই না?

অমিত মুখখানা করুণ করে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? আমাকে কেন?

বাঃ, তার আমি কি জানি?

আমি একটু ভয় পাচ্ছি।

ভয় কিসের?

উনি যে মোটর গ্যারেজ করতে চাইছেন তা খুব বড় প্রোজেক্ট। অনেক টাকার ব্যাপার।

উনি যা করেন তা একটু বড় স্কেলেই করেন। উনি একটা মোটরগাড়ির কারখানাও করতে চেয়েছিলেন। সরকার পারমিশন দেয়নি। উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

মোটর গ্যারেজ তো আর গাড়ি তৈরি করবে না।

তার আমি কি জানি।

অমিত চাপা গলায় বলল, মলয়বাবু কেমন লোক তা জানেন?

সুপর্ণা মাথা নেড়ে বলে, সব কথা বলতে নেই। নিজেই জানতে পারবেন।

একটু বলুন না, আমি যে ভয় পাচ্ছি।

সুপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, বড়লোকের লচ্ছা ছেলেরা যেরকম হয় ঠিক সেরকম। তফাতের মধ্যে মলয়বাবু একটু গম্ভীর প্রকৃতির।

শুনলাম এ্যাগ্রেসিভ।

ঠিকই শুনেছেন। মলয়বাবু এক সময়ে শহরের পয়লা নম্বর গুন্ডাও ছিলেন। বিরাট দল ছিল। এখন নিজে গুন্ডামি করেন না। তবে দলটা আছে। তারা করে।

গুণ্ডা! বলে একটু ভাবিত হয়ে পড়ল অমিত।

গুন্ডা বলে নয়, আসলে লোকটা খুব খেয়ালীও। কখন যে কী করবে তার ঠিক নেই। কেউ কেউ বলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট।

সত্যি নাকি?

কী করে বলব? এত কথা তো আমার বলাও উচিত নয়। আপনার ভয় দেখে মায়া হলো বলে বললাম।

আমি একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করি সে তো বলেছি। আমার আয় খুব বেশী নয়। কিন্তু আমার বেশ চলে যায়। আমি ভাবছি রিস্ক নিয়ে এখানে আসা ঠিক হবে কিনা।

ওমা! কেন আসবেন না? মলয়বাবু যেমনই হোক, ওঁর বাবা রামমোহনবাবুর মতো মানুষ হয় না। এক কথার লোক। যেমন রোখ তেমনি ব্রড মাইন্ডেড। রামমোহনবাবুর সুনজরে পড়া ভাগ্যের কথা।

কিন্তু মলয়বাবু যদি আমাকে পছন্দ না করেন?

উনি কাউকেই পছন্দ করেন না। এখন তো একদম একা থাকেন। সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন বন্ধু আসে, তাদের সঙ্গে বসে ড্রিংক করেন বলে শুনেছি। উনি আপনাকে পছন্দ করবেন না এটা ঠিক। কিন্তু রামমোহনবাবু আপনার পক্ষে থাকলে ভয় নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অমিত বলল, মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।

কিছু মুশকিল নয়, ভালই হবে। জ্বর গায়ে বেশি টেনশন কিন্তু ভাল নয়। একটু ঘুমোন তো। জ্বরটা ছাড়ছে?

হ্যাঁ, ওষুধ খেলে জ্বর ছেড়ে যায়।

হ্যাঁ, প্যারাসিটামলের তো ওইটেই কাজ। একটু ঘুমিয়ে নিন।

অমিত ঘুমোলো। নানারকম অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। ঘন্টা দুয়েক বাদে তাকে টেনে তুলে জোর করে গা স্পঞ্জ করিয়ে দিল সুপর্ণা। লজ্জায় মরে গেল অমিত।

তারপর সুরুয়া খেতে হলো। তারপর ভাত এল।

জ্বরে আজকাল ডাক্তাররা ভাত দেয়, না?

নিশ্চয়ই। ভাতের সঙ্গে জ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। নিশ্চিন্তে খান।

অমিত খেল।

সুপর্ণা পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আপনার কেউ নেই তো, না?

না। কেউ নেই।

আপনি অদ্ভুত মানুষ। বেশ জীবন আপনার।

দশ দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ল অমিতের। বন্ধুরা এতদিন অনেক দূর চলে গেছে। কোনও খবর অবশ্য পায়নি

অমিত। মনটা তাই একটু খারাপ লাগছিল। কাল রাতে বন্ধুদের নিয়ে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটা ছিল, হাইওয়ের ধারে তিনটে ভাঙাচোরা দোমড়ানো সাইকেল আর তিনটে ছিন্নভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওরা কারা তা চেনা যাচ্ছে না। আর অমিত প্রাণপণে চিৎকার করছে বন্ধুদের নাম ধরে ডেকে। রাতে নার্স কণিকাদি তাকে ডেকে তুলে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ালেন।

ভোরবেলা অমিত টের পেল তার শরীর ঠান্ডা আর ভীষণ দুর্বল। গলা শুকনো।

কণিকাদি কপালে হাত দিয়ে বললেন, এই তো সেরে গেছ!

শরীরটা ভীষণ দুর্বল।

তা তো হবেই। বিছানা ছেড়ে উঠতে এখনও দেরি আছে। তবে তোমার স্বাস্থ্যটি ভাল, তাড়াতাড়িই উঠে পড়বে।

কণিকাদি জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলেন। বাইরে ভোরের রোদ ঝলমল করছে। কাল রাতে কিসের স্বপ্ন দেখেছিলে বলো তো! মনে হলো ভয় পেয়েছো।

খুব ভয় কণিকাদি, একটা অ্যাকসিডেন্টের স্বপ্ন! মনে হলো আমার বন্ধুদের একটা ট্রাক যেন চাপা দিয়ে চলে গেছে।

ও কিছু নয়, বন্ধুদের কথা খুব ভাবছো তো, তাই।

হ্যাঁ, খুব ভাবছি।

শুনলাম, তুমি রামমোহনবাবুর কাছেই চাকরি করবে। সত্যি নাকি?

সেরকম একটা কথা আছে।

দেখলে তো, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তোমার যাওয়া হলো না বটে, কিন্তু মস্ত একটা সুযোগ তো পেলে।

মৃদু একটু হাসল অমিত। কণিকাদি তার জন্য প্রোটিনের গুঁড়ো দুধে মেশাতে মেশাতে বললেন, বউটা খুব পাজী ছিল। শাস্তিও হলো সেইরকম।

কী বলছেন কণিকাদি?

কাউকে বোলো না আবার। রামমোহনবাবুর পালানো বউটা তো খুন হয়েছে শুনছি।

একটু চমকে উঠে অমিত বলল, কবে?

কাল সন্ধ্যেবেলা। জিটি রোডের ধারে লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ এসেছিল অনেক রাতে।

অমিত অস্বস্তি বোধ করে বলে, খুন?

খুনই। গলার নলি কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সর্বনাশ!

কিসের সর্বনাশ? কি যে পাজী ছিল বললে বিশ্বাস করবে না। ওর মা-টা তো আরও পাজী।

অমিত কাউকেই চেনে না, সে চুপ করে থাকল।

কণিকাদি দুধের গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, কর্তাবাবুর কত টাকা-পয়সা আর সোনাদানা যে সরিয়েছে তার হিসেব নেই। আদায় করত, আবার চুরিও করত।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘটনাটা শুনে তার ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে রামমোহনবাবু বোধহয়

ঝামেলায় পড়বেন।

খুন করল কে কণিকাদি?

যেই করুক একটা ভাল কাজ করেছে।

অমিত বলল, আপনি কাকিমাকে পছন্দ করতেন না, না?

কাকিমা! কাকিমা আবার কে? ওই বদমাশ মেয়েকে আর কাকিমা বলে আদিখ্যেতা কোরো না। বাইজীর মেয়ে, কত আর হবে! কর্তাবাবুকে তুক করে রেখেছিল। আপদ গেছে বাবা।

পুলিশ এ বাড়িতে কেন এসেছিল?

আসবে না? একটা খুন হলে খোঁজখবর তো করতে হয়।

অমিত দুধটা খেয়ে বিস্বাদে মুখটা বিকৃত করে বলল, তা বটে।

বিছানাটা টানটান করে দিয়ে কণিকাদি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। একটু বাদেই সুপর্ণা এল। সুপর্ণা যখনই আসে তার মুখে একটা সুন্দর হাসি থাকে। চোখ দুটোও যেন কথা কয়। আজ সুপর্ণার মুখে হাসি ছিল না। চোখে উদ্বেগ। বোধহয় খবরটা শুনেছে।

অমিত বলল, আজ আপনি খুব গম্ভীর।

সুপর্ণা গায়ের চাদরটা ভাঁজ করে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে বাথরুমে গেল। জবাব দিল না।

ফিরে এসে বলল, ঘটনা ঘটেছে।

জানি। পুলিশ এসেছিল।

পুলিশ আজও এসেছে এবং আপনার কাছেও আসবে।

অমিত অবাক হয়ে বলে, আমার কাছে! আমার কাছে কেন?

রামমোহনবাবুর স্ত্রী যেদিন পালিয়ে যান সেদিন আপনারা এ বাড়িতে ছিলেন।

হ্যাঁ, তাতে কি?

কে জানে কি! শুনে এলাম ওরা আপনাকেও জেরা করতে চায়।

অমিত জীবনে কখনও পুলিশের মুখোমুখি হয়নি। উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আমি তো কিছুই জানি না।

সেটাই বলবেন। আজ সকালে আপনাকে ফলের রস খেতে হবে কিন্তু।

আর ফলের রস! কী ঝামেলা হলো বলুন তো!

আপনার আবার ঝামেলা কিসের? যা জানতে চায় বলে দেবেন। আপনার তো লুকোনোর কিছুই নেই।

রামমোহনবাবু কোথায়?

পুলিশ তাকে জেরা করছে।

অমিত একটু চুপ করে থেকে বলল, পুলিশ জাতটা খুব সন্দেহপ্রবণ।

তাই নাকি? কি করে জানলেন?

আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানে একটা বউ গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মারা যায়। তাও তার বাপের বাড়িতে। তবু পুলিশ তার স্বামীকে খুব হ্যারাস করেছিল। হাজতে নিয়ে আটকে রেখেছিল। তখনই শুনেছি বউ খুন হলে নাকি স্বামীকে সন্দেহ করাই নিয়ম।

সুপর্ণা একটু হাসল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই হয় যে। পুরুষগুলো ভীষণ পাজী।

রামমোহনবাবুও কি পাজী?

তা মোটেই বলিনি। উনি ভীষণ ভাল। আপনি একটু দুষ্টু আছেন।

তাই নাকি?

একটা রস করার ঘূর্ণিকলে মুসুম্বির টুকরো ফেলে চালিয়ে দিল সুপর্ণা। চোখের পলকে রস হয়ে গেল। কল-কব্জার যুগই এটা বটে! অমিত দেখল মেশিনটার এক মুখ দিয়ে রস, অন্য মুখ দিয়ে ছিবড়ে বেরিয়ে গেল। রসটা ছেঁকে গেলাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সুপর্ণা বলল, জ্বর তো ছেড়ে গেছে। এখন কি হবে?

কি আর হবে। বেহালায় ফিরে যাবো।

ও মা! বেহালায় ফিরবেন কেন? রামমোহনবাবুর গ্যারেজের কি হবে?

অমিত মাথা নেড়ে বলল, ওটা আর হবে বলে মনে হয় না, ঝামেলা পাকিয়ে গেল যে!

রামমোহনবাবুর ঝামেলারই কপাল। চিরকাল ওকে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পুইয়ে বড় হতে হয়েছে। সহজে হার মানার পাত্র নন। এসব ঘটনা ওর কাছে কিছুই নয়।

তার মানে কি রামমোহনবাবুর জীবনে এরকম অনেক ঘটনা আছে?

তাও বলিনি। আমি বলেছি মানুষকে বড় হতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি পার হয়েই হতে হয়।

ওঁর স্ত্রী কেমন মানুষ ছিলেন?

সুপর্ণা ভ্রু কুঁচকে বলল, তার আমি কি জানি?

অমিত ভয়ে আর সুপর্ণাকে কোনও প্রশ্ন করল না। দু-তিন মিনিট দুজনেই চুপচাপ। সুপর্ণা রস করবার মেশিনটা পরিষ্কার করছিল। অমিত হাই তুলছিল। বাইরে দু'জোড়া বুটের শব্দ শোনা গেল। দরজায় নক। তারপরই দু'জন পুলিশের পোশাক পরা লোক ঘরে ঢুকে দাঁড়াল।

সামনের জন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ। পিছনের জনও তাগড়াই, তবে কালো এবং কর্কশ চেহারার।

সামনের জন তাকেই জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি অমিত চৌধুরী?

আজ্ঞে হ্যাঁ, গলাটা একটু কেঁপে গেল অমিতের।

আপনি কতদিন অসুস্থ?

দশ-বারো দিন হবে।

রামমোহনবাবু আপনার কেউ হয়?

না, আমার বন্ধুর কাকা।

ও।

সুপর্ণা চেয়ার এগিয়ে দিলে ভদ্রলোক বসলেন। পিছনের জনকে একটা টুল এগিয়ে দিল সুপর্ণা, কিন্তু লোকটা বসল না। নোটবই আর ডটপেন বাগিয়ে লোকটা বলল, যেদিন ঘটনাটা ঘটে আপনি সেদিন এ বাড়ীতে ছিলেন?

কোন ঘটনাটা?

যেদিন রামমোহনবাবুর স্ত্রী এ বাড়ী থেকে চলে যান।

আমি ঘটনাটার কথা কিছু জানি না। তবে শুনেছি।

কী শুনেছেন?

শুনেছি উনি চলে গেছেন।

আপনারা কখন এ বাড়িতে পৌঁছোন?

সন্ধ্যেবেলা।

কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি বা চেঁচামেচি হয়েছিল?

না তো!

কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি?

না।

কিচ্ছু না? মনে করে দেখুন।

একটু দ্বিধা করল অমিত। মাঝরাতে তাদের ঘরে মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা ঢুকে আলমারী থেকে কিছু নিয়ে যান। কিন্তু কথাটা বলার মানেই হয় না।

সে বলল, না।

আপনি একটু ফলটার করলেন, কেন?

ভাল করে ভেবে দেখলাম।

রামমোহনবাবুর স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন?

না, উনি আমাদের সামনে আসেননি।

সেটাও তো অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই না?

তা তো জানি না। আমরা বাইরের লোক, আমাদের সামনে নাও আসতে পারেন।

আপনার সেই রাতেই অসুখ করেছিল?

হ্যাঁ। খুব জ্বর হয়েছিল।

আপনি তো একজন মোটর মেকানিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামমোহনবাবুর সঙ্গে সম্পর্কও নেই! তাহলে আপনাকে এত খাতির-যত্ন করা হচ্ছে কেন বলুন তো! এটা মুখ বন্ধ রাখার জন্য নয় তো! আপনি হয়তো সেই রাতে কিছু দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন।

না। রামমোহনবাবু অত জ্বর দেখে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

হাসপাতাল ছিল। ওঁর নার্সিং হোমও আছে। বাড়িতে রাখলেন কেন?

তা তো জানি না।

ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। তাই না?

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ওরকম ভাবে ভাবিনি।

আচ্ছা, রেস্ট নিন। আবার দেখা হবে। একটা কথা বলে যাই, বর্ধমান ছাড়তে হলে আমাদের না জানিয়ে যাবেন না। তাহলে অ্যারেস্ট করতে হবে।

সে কী! আমি তো কিছু করিনি।

আপনাকে আমাদের দরকার। ভাল কথা, আপনি কি জানেন যে, রামমোহনবাবুর স্ত্রী রিনি খুন হয়েছেন?

জানি।

কি করে জানলেন?

শুনেছি।

কার কাছে শুনলেন?

সবাই বলাবলি করছে।

কিভাবে খুন হয়েছেন তা জানেন?

শোনা কথা। গলা কাটা হয়েছিল।

বাঃ, সবই তো জানেন দেখছি।

পুলিশরা এরপর সুপর্ণার দিকে মনোযোগ দিল।

আপনি কে?

নার্স।

এই ছেলেটির নার্সিং করছেন?

হ্যাঁ।

বাঃ, বেশ ভাল ব্যবস্থা তো। সামান্য জ্বরের জন্য নার্সও লাগে নাকি?

এঁর টাইফয়েড হয়েছিল।

হলেই বা। টাইফয়েড তো কোনও মারাত্মক রোগ নয়। আপনার ট্রেনিং আছে?

হ্যাঁ। আমি রামমোহনবাবুর নার্সিং হোম-এ আছি।

বেশ বেশ। বলে অফিসারটি গা-জ্বালানো হাসি হাসলেন।

সুপর্ণার মুখটা একটু কঠিন হয়ে গেল। কিছু বলল না সে।

অফিসারটি একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আপনি কি এখানে নাইট ডিউটিও করছেন?

সুপর্ণা খুব নরম গলায় বলল, না। আমার ডিউটি সকালে।

রাতে কে থাকে?

আর একজন।

আপনি রামমোহনবাবুর নার্সিং হোমে কতদিন আছেন?

দু'বছর।

বাড়ির ঠিকানা?

বড় নীলপুর। সুবিনয় বিশ্বাসের বাড়ী।

অফিসার একটু চমকালেন, সুবিনয় বিশ্বাস?

হ্যাঁ।

কোন সুবিনয়?

আমার বাবা কলকাতায় পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন।

অফিসারটি সামান্য লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনি সুবিনয়দার মেয়ে! কী আশ্চর্য!

সুপর্ণা কিছু বলল না, চুপ করে রইল।

অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে সুপর্ণাকে বললেন, আপনার বাবা আমাকে চেনেন। গৌরাঙ্গ ঘোষ বললেই চিনবেন। আপনাকেও আমি ছোটো দেখেছি।

আমার বাবা বেঁচে নেই।

আহা, কবে মারা গেছেন?

মাস ছয়েক হলো।

হি ওয়াজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান। আচ্ছা, আজ যাচ্ছি। পরে দেখা হবে।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর অমিত বলল, আপনি পুলিশের মেয়ে বলেই পুলিশকে ভয় পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার এত নার্ভাস লাগছে। সত্যিই তো, আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে রামমোহনবাবু এত খাতির করছেন কেন?

ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন কেন?

পুলিশ বোধহয় আমাকে সন্দেহ করছে।

সন্দেহ করাই পুলিশের কাজ। গা-জ্বালানো প্রশ্ন করে ওরা লোককে নার্ভাস করে দিতে চায়। ঘাবড়াবেন না।

আমি কখনও এরকম পরিস্থিতিতে পড়িনি। তাই ভয় হচ্ছে। আমি একটা ঘটনা দেখেছিলাম। আপনাকে বলব?

বলুন না।

যেদিন রামমোহনবাবুর স্ত্রী পালিয়ে যান সেদিন অনেক রাতে জ্বরের জন্য আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। একজন মধ্যবয়স্কা সুন্দরী মহিলা আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন। একটা আলমারী খুলে কিছু একটা বের করে নিয়ে ফের চলে যান।

সুপর্ণা অবাক হয়ে বলে, এ কথাটা পুলিশকেও বলতে পারতেন।

ভয় করছিল। কোন ফ্যাকড়া বের করে ফেলে কে জানে।

আপনি সত্যিই ভীতু।

তাহলে কি বলব পুলিশকে?

সুপর্ণা একটু ভেবে বলল, বরং ঘটনাটা আপনি রামমোহনবাবুকে আগে বলুন। হয়তো মহিলা কিছু সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

ভদ্রমহিলা কে জানেন?

আন্দাজ করা শক্ত নয়। রিনির মা।

উনি কি বাইজী ছিলেন?

অত খোঁজে আপনার দরকার কী?

সুপর্ণার গম্ভীর মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলো অমিত। সুপর্ণা এমনিতে সাদামাটা কিন্তু মাঝে মাঝে মেয়েটার মধ্যে যেন ইস্পাত ঝলসে ওঠে।

সুপর্ণা কিছুক্ষণ আপনমনে টেবিলটা গোছাল। তারপর দু'মিনিটের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে এলো। তারপর বলল, কাল থেকে কিন্তু আমি আসব না।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কেন?

সুপর্ণা ভ্রুভঙ্গি করে বলে, আমাকে আর কিসের দরকার? অসুখে নার্স লাগে। ভাল হয়ে গেলে তো আর লাগে না।

ওঃ তাই তো। বলে অমিত হেসে ফেলল, আমি এমন বোকা।

তা বোকা একটু আছেন।

হ্যাঁ, আমি বেশ বোকা। আপনি এখন থেকে নার্সিংহোমে ডিউটি করবেন তো?

হ্যাঁ। কেন?

এমনিই। আমিও বোধহয় কাল বা পরশু চলে যাবো।

কাল-পরশু পারবেন না। শরীর কতটা দুর্বল তা কি টের পাচ্ছেন না?

পাচ্ছি। তবে আমি পারব।

ঠিক আছে। রামমোহন বাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন।

সুপর্ণা আজ একটু গম্ভীর হয়ে আছে। অন্যদিনের মতো মুখটা হাসি-খুশি নয়। অমিতও আর ঘাঁটাল না। রামমোহনবাবু এলেন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

কেমন আছো আজ?

অমিত কৃতজ্ঞ গলায় বলল, ভাল আছি। জ্বর নেই।

বাঃ বেশ। পুলিশ একটু বিরক্ত করেছে তো তোমাকে?

না, বিরক্ত কিছু নয়।

রামমোহনবাবু একটু হেসে বললেন, বউ খুন হলে স্বামীদের সন্দেহ করাটাই নিয়ম। রিনিকে খুন করার আরও কারণ তো আমার আছেই। কাজেই আমার খুব হয়রানি যাচ্ছে।

অমিত সমবেদনার সঙ্গে চুপ করে রইল। রামমোহনবাবু ধীর গলায় বললেন, এসব নিয়ে ভেবো না বা ঘাবড়ে যেও না। জীবনটা অনেক বড় এবং খুব বিচিত্র। বুঝলে?

আজ্ঞে।

সুপর্ণা, অমিত কবে ছুটি পেতে পারে বলো তো!

তিন-চার দিন লাগবে।

তাহলে ওকে রুগীর ঘরে ফেলে না রেখে অন্য ঘরে শিফট করে দিলেই তো হয়।

স্পঞ্জ করা বা মাথা ধোয়াতে এ ঘরেই সুবিধে। দু'দিন এখানেই থাকুন।

তাই হোক তাহলে। অমিত, তুমি মনস্থির করেছো তো?

কিসের?

আমার গ্যারেজের ভার নেবে যে!

যে আজ্ঞে।

তাহলে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। চিয়ার আপ।

রামমোহন চলে যাওয়ার পর অমিত একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইল। একটা অল পারপাস গ্যারেজ করার পিছনে আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? লোকটা নিশ্চয়ই কল্পনাবিলাসী নয়। কী মতলব তাহলে?

অত কী ভাবছেন?

অমিত মৃদুকণ্ঠে বলল, অনেক কিছু।

ভাবুন। আমি একটু ঘুরে আসছি।

সুপর্ণা চলে যাওয়ার পর অমিত সাহস করে তার খাট থেকে নামল। দুর্বল বটে, কিন্তু সাংঘাতিক কিছু নয়। সাবধানে পা ফেলে সে করিডোরে এসে দাঁড়াল। একদিকে ঘষা কাচের শার্সি, অন্যধারে বন্ধ দরজার তিনটে ঘর। নির্জন, করিডোরের মাঝামাঝি ডান ধারে একটা দরজা। হাতলটা ঘুরিয়ে ঠেলতেই খুলে গেলো। সামনে খোলা বারান্দা, ফুরফুর করছে শীতের বাতাস আর রোদ। সামনে ফাঁকা জমি। জমি ঘিরে নিবিড় কয়েকটা গাছ। লন-এ নেমে একটু ঘোরাঘুরি করল অমিত। তার দাড়ি খুব বেড়েছে, কুটকুট করছে। চুলও বেশ লম্বা হয়েছে। সে কি আজ দাড়ি কাটতে অনুমতি পাবে? বোধ হয় এরা আপত্তি করবে, থাকগে তাহলে। ফটকের কাছ বরাবর আউটহাউসটা সে দেখতে পাচ্ছিল। আউটহাউস কেন বলা হয় তা সে জানে না। দিব্যি মাঝারি একটা দোতলা বাড়ি। বেশ অনেকটা ব্যারাকবাড়ির মতোই লম্বা। বাড়িটার মাঝখান দিয়ে সদরের ফটক। অত বড় বাড়ির কী দরকার ছিল ফটকের দুপাশে কে জানে?

ওই বাড়িটায় খেয়ালী রাজপুত্র থাকে। তার নাম মলয়। ওই মলয়ের মন বুঝেই তাকে চলতে হবে। পারবে কি অমিত? তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ দেখতে পেল ফটক দিয়ে একটা সাদা ফিয়াট গাড়ি সাঁ করে ভিতরে এসে বাড়িটার সামনে থামল। গাড়ি থেকে একজন কালো মোটাসোটা লোক নেমে এল। বাবরি চুল। পরনে গ্রে রঙের সুট। মুখে একটু গাম্ভীর্য বা বিরক্তি। লোকটা ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল। উনিই কি মলয়?

একটু সাহস সঞ্চয় করে অমিত এগিয়ে গেল। লনটা পেরিয়ে ফিয়াট গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা খুব নতুন নয়, কিন্তু দারুণ রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। বডি চকচক করছে। ড্যাশবোর্ডের প্যানেলটা বোধহয় পাল্টানো হয়েছে সম্প্রতি। কুলার লাগানো আছে। গদিটদি বেশ ভাল ভেলভেটে মোড়া। ভুঁইফোড় একটা লোক কোথা থেকে সামনে উদয় হয়ে বলল, আপনি কে বলুন তো! এখানে কী করছেন?

অমিত দেখল, বেশ মস্তান টাইপের চেহারার ছিপছিপে কালো এক ছোকরা। অমিত অন্যায় কিছু করেনি। শান্ত গলায় বলল, গাড়িটা একটু দেখছিলাম।

এ বাড়িতে তো আপনাকে আগে দেখিনি।

না। আমি কলকাতায় থাকি। এখানে এসে অসুখ হওয়ায় রামমোহনবাবু রেখে দিয়েছিলেন।

ছোকরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, অ, সেই মোটর মেকানিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুব মজায় ছিলেন তো!

তা বটে।

লাকি ডগ। অসুখ কি সেরে গেল নাকি?

লোকটার কথাবার্তা চাঁছাছোলা হলেও অমিতের খুব একটা খারাপ লাগছিল না। সে একটু হেসে বলল, আপনি কি এ বাড়ির লোক?

এ বাড়ির লোক-ফোক নই। আসি যাই, আমার নাম স্বপন বণিক।

অমিত বলল, ও।

আপনি কোথাকার মোটর মেকানিক?

বেহালার একটা বড় গ্যারেজে কাজ করি।

ছোকরা তাকে একটু চোখে মেপে নিয়ে বলল, ভুখ্‌খা পার্টি নাকি?

অমিত ফের হাসল, তাই বটে। আমি নিতান্তই গরিব।

গ্যারেজে তো পয়সা আছে।

মালিকের আছে। আমরা তো সামান্য মাইনে পাই।

দু'নম্বরী নেই?

আমার ওসব নেই।

ছোকরা হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভারের দিককার দরজাটা খুলে বলল, উঠুন।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কেন?

আরে উঠে পড়ুন না।

না না, সে কি?

আরে মশাই মলয়দার গাড়ি মানে আমারও গাড়ি। উঠুন, কেউ কিছু বলবে না।

উঠে কি করব?

একটু চালাবেন। ভয় নেই, আমি সঙ্গে থাকব। চালিয়ে বলতে হবে গাড়িটার কি ডিফেক্ট আছে। পারবেন?

অমিত খুব অস্বস্তি বোধ করে বলল, আজই আমার জ্বর ছেড়েছে। আমি পারব চালাতে?

একটা রাউন্ড দেবেন। পরিশ্রম তো আর হবে না, উঠুন।

অগত্যা অমিত উঠল। ছোকরাটি উঠে পাশে বসে বলল, স্টার্ট দিন।

চাবি ড্যাশবোর্ডে লাগানোই ছিল। অমিত গাড়িটা স্টার্ট দিল। চমৎকার স্টার্ট নিল গাড়ি।

ধীরে গাড়িটা ঘুরিয়ে ফটকের বাইরে এনে ফেলল অমিত। সামনে ঘিঞ্জি রাস্তা। রিকশা, মানুষ, সাইকেলের বিশ্রী ভিড়। সে সাবধানে গাড়িটা বাঁ ধারে চালিয়ে নিতে লাগল।

কেমন লাগছে?

ভাল। তবে ডিফারেনসিয়ালে একটা আওয়াজ আছে।

আর?

ইঞ্জিনটা হট আপ করা। পিক আপ ভাল, কিন্তু স্পীড বেশি।

আর?

আর সব ঠিকই আছে বোধহয়।

চালান।

বেশ অনেকটাই চালাতে হলো অমিতকে। স্বপন রাস্তা বলে দিচ্ছিল। একবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, সুপর্ণার সঙ্গে কেমন জমেছে?

অমিত অবাক হয়ে বলে, মানে?

মানে আর কী! বলে স্বপন একটু হাসল।

অমিত সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বলল, আমি কিন্তু সামান্য একজন মোটর মেকানিক। আমার বিত্ত-বৈভব কিছু নেই। আমাকে ওরকম করে বলবেন না, প্লীজ!

ছিলেন তো পুঁটি মাছ, সে আমরা জানি, কিন্তু রামমোহনবাবু তো আপনাকে রাঘববোয়াল করে তুলছেন।

সেটা ওঁর দয়া। তবে উনি আমাকে মেকানিক হিসেবেই চাকরি দিচ্ছেন। তার বেশি কিছু নয়।

আরে মশাই, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? সুপর্ণা এমন কিছু সাংঘাতিক মেয়ে নয়। ওর বাবা পুলিশের ভাল অফিসার ছিল বটে, কিন্তু টাকা করতে পারেনি।

অমিত করুণ গলায় বলল, এসব কথা কেন বলছেন?

বলছি, আপনাকে সাহস দেওয়ার জন্য।

জিটি রোডে উঠে শহরের বাইরের দিকে গাড়িটা কিছুক্ষণ চালিয়ে নিল অমিত। তারপর বলল, এবার কি ফিরব?

হ্যাঁ। আমি আপনার হাতটা একটু দেখলাম।

অমিত হাসল। বলল, মেকানিককে গাড়ি চালাতেই হয়।

ফেরার পথে স্বপন হঠাৎ বলল, মলয়দার সঙ্গে আলাপ হয়নি?

না, আমি তো জ্বরে পড়েছিলাম।

মলয়দা সম্পর্কে কিছু শোনেননি?

অমিত মিথ্যে করে বলল, না তো!

কেউ বলেনি আপনাকে যে, মলয়দা একটা বাজে টাইপের লোক। মাতাল, দুশ্চরিত্র, খেয়ালী!

না না। আমার কানে কিছু আসেনি।

না শুনে থাকলে এবার শুনবেন। অনেক কথা কানে আসবে।

আমার শুনে কি হবে?

শুনে রাখা ভাল। মলয়দাকে টার্গেট করেই তো গ্যারেজটা হচ্ছে। আপনাকে ওর সঙ্গেই কাজ করতে হবে হয়তো, যদি অবশ্য মলয়দা রাজী হয়।

সে রকম একটা কথা রামমোহনবাবু বলেছিলেন।

তাহলে তৈরি থাকুন। মলয়দাকে ম্যানেজ করা সোজা কাজ নয়।

অমিত ফের অস্বস্তি বোধ করে বলল, মোটর গ্যারেজে উনি কি করবেন? গ্যারেজ আর এমন কি একটা ভাল

জায়গা?

আপনি কি ভাবছেন যে, রামমোহনবাবু একটা সাধারণ গাড়ি মেরামত করার দোকান করছেন? তা নয়। এ গ্যারেজে ভিন্টেজ কার থেকে শুরু করে নানারকম গাড়ি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হবে। মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে গবেষণারও কথা আছে। রামমোহন শেষ অবধি একটা গাড়ি তৈরির কারখানা করতে চান।

ও বাবা!

অবাক হওয়ার কিছু নেই। উনি এরকম অনেক স্বপ্ন দেখেন। বেশির ভাগই ফলে না। তবে টাকা ওড়ে। কিছু কামিয়ে নিতে পারেন।

অমিত বলল, কামিয়ে নেবো?

তাই তো বলছি, রামমোহনের অনেক প্রজেক্ট উঠে গেছে, কিন্তু বেশকিছু লোক গুছিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু তাহলে উনি এখনও এতো বড়লোক থাকেন কি করে?

কপাল। ওর একটা যায় তো আর একটা আসে। লোকটার বিজনেসের মাথা দারুণ। টাকার গন্ধ পায়।

অমিত একটু ভেবে বলল, উনি কি খুব খেয়ালী?

একটু আছেন।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন না!

আপনি কি মলয়বাবুর বন্ধু?

স্বপন একটু হাসল। বলল, বন্ধুর মতোই, বডিগার্ডও বলতে পারেন।

ওঁর কি বডিগার্ড দরকার হয়?

হয়, মলয়দার শত্রু বা বন্ধু কোনওটারই অভাব নেই।

স্বপনের দিকে আড়চোখে একটু তাকাল অমিত। ছেলেটা মস্তান টাইপেরই। বেশ চালাক-চতুর। সাহসও হয়তো আছে।

স্বপন বলল, খুনের খবরটা শুনেছেন?

শুনেছি।

পুলিশ তো আপনাকেও জেরা করেছে?

হ্যাঁ।

কি জিজ্ঞেস করল?

মামুলি সব কথা। আমি তো কিছুই জানি না। ভদ্রমহিলাকে চোখেই দেখিনি।

সত্যি বলছেন?

মিথ্যে বলতে যাবো কেন? কী লাভ?

স্বপন একটু চুপ করে থেকে বলল, বহুৎ মাল খসিয়ে গেছে।

কী বললেন?

বলছি হারামি মেয়েছেলেটার কথা। ওর মা-টা আরও নষ্টা।

অমিত চুপ করে থাকে।

বাড়িতে এসে স্বপন বলল, ঠিক আছে। এবার ঘরে যান।

অমিতের দুর্বল লাগছিল। ঘরে এসেই সে শুয়ে পড়ল।

সুপর্ণা ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে বলল, কোথায় গিয়েছিলেন?

একটু বাইরে।

স্বপন বণিকের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কেন? ওকে কি আপনি চেনেন?

না, চেনা হলো?

কি রকম চেনা হলো?

যেমন হয়।

সুপর্ণা যেন খুশি হলো না। বলল, হুট করে গাড়ি চালানো ঠিক হয়নি। আপনার ব্যালান্স নেই। কতদিন শুয়ে আছেন বলুন তো!

ওই ছেলেটা কি একটু গুণ্ডা টাইপের? এমন হুকুম করে কথা বলছিল যে আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল।

সুপর্ণা মুখটা বিকৃত করে বলল, ছেলেটা ভালো নয়। আপনাকে কি অপমান করছিল?

না, তা নয়, তবে একটু র‍্যালা নিচ্ছিল।

বেশি পাত্তা দেবেন না।

আপনাকে একটা কথা বলব?

বলুন না।

শুনলে আপনি রেগে যাবেন না তো!

রাগার মতো কথা বললে রাগব। কী কথা?

রাগলে বলার দরকার কি?

সুপর্ণা একটু হেসে বলল, আচ্ছা রাগব না। অন্তত রাগটা প্রকাশ করব না।

সেটাও খারাপ। আমার মনে হলো স্বপন বণিক আপনার সম্পর্কে একটু ইন্টারেস্টেড।

সুপর্ণা একটু যেন চমকে এবং থতমত খেয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, কী বলছিল?

ওর ভাষাজ্ঞান নেই, আমাকে জিজ্ঞেস করল, সুপর্ণার সঙ্গে কেমন জমেছে? আমি বললাম, আমি গরিব মোটর মেকানিক, পেটে বিদ্যে নেই, আমার কি ওসব সাজে?

সুপর্ণা একটু স্তব্ধ থেকে বলল, এতো কথা হয়েছে?

হ্যাঁ, আপনি রাগ করলেন না তো!

রাগ করলে আপনার কি?

দোষটা তো আমার নয়। ও বলছিল, আমি সেটাই বললাম।

ঠিক আছে। রাগ করিনি। তবে সামান্য মোটর মেকানিক বলে ওসব লোকের কাছে হাত কচলানোটাও উচিত নয়।

হয়তো ভেবেছে আমি কোনও সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু আমার যে সে যোগ্যতাই নেই সেটা তো জানে না।

যোগ্যতা নেই বুঝি! বলে সুপর্ণা একটু হাসল। তারপর বলল, স্বপন খারাপ ছেলে। কিন্তু ওর দু'একটা গুণও আছে। সাংঘাতিক বুদ্ধি আর মলয়দার প্রতি ভালবাসা। এ দুটোর জোরে টিকে আছে।

মনে হচ্ছে ছেলেটা আমাকে একটু ইনফ্লুয়েন্স করতে চায়। কেন তা বুঝতে পারছি না।

এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। খেয়ে একটু ঘুমোন।

আবার ঘুম! কতো ঘুমোবো বলুন তো! আমার যে শয্যাকন্টকী হওয়ার অবস্থা।

সুপর্ণা একটু হেসে বলল, তা ঠিক, তবে এ সময়ে রেস্টও দরকার।

আমি কিন্তু কাজ করতে ভালবাসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কাজ ভালবাসি বলে মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি আমি খুব ভাল চিনি। কাজ করতে করতেই আমার রেস্ট হয়। শুয়ে বসে থাকলে হয় না।

ভালই তো, কিন্তু এখন তো আপনাকে আমি মোটরগাড়ির কাজ দিতে পারব না।

লজ্জা পেয়ে অমিত বলল, আমি কি তাই বললাম! আসলে আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমার বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ছে। এখন ওরা কত দূরে চলে গেছে বলুন তো।

সুপর্ণা মায়াভরা চোখে চেয়ে বলে, তা ঠিক।

জিটি রোডের ওপর, শহরের বাইরে রামমোহনবাবুর মস্ত কোল্ড স্টোরেজ। তার পাশেই অনেকটা জমি। সেখানেই গ্যারেজ হওয়ার কথা। রামমোহন অমিতকে জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গেলেন দিন দুই পর। গাড়ি থেকে নেমে কাঁটাতারে ঘেরা এবড়ো-থেবড়ো জমিতে ঢুকে অমিত দেখল জমির অর্ধেকটা জলে ডোবা। বাকি অর্ধেক জমিতে জঙ্গল। সে বলল, জায়গা তো ভালই, কিন্তু–

রামমোহনবাবু গম্ভীর গলায় বলেন, কিন্তু কি?

এতো বড় জমি তো লাগবে না।

রামমোহনবাবু একটু চুপ করে যেন কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, আমার প্ল্যানটা তোমাকে বলি। সরকারের কাছে অনেকদিন ধরে আমি একটা মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা খোলার লাইসেন্স চাইছি। ফরেন কোলাবোরেশনেরও কথা অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু সরকার লাইসেন্স দিতে চায় না। কেন চায় না তার অনেক কারণ আছে। আমি ঠিক করেছি প্রাইভেটলি কিছু নতুন ধরনের গাড়ির নমুনা তৈরি করি।

অমিত মনে মনে প্রমাদ গুনল, এই সফল ব্যবসায়ী ও ধনী মানুষটির ভিতরে যে একটা পাগলামিও আছে তো সে টের পাচ্ছে।

মিনমিন করে সে বলল, সে তো ভাল কথা, কিন্তু তাতে আবার অনেক টাকা ঢালতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং তো বিরাট ব্যাপার।

আমি সেই ব্যাপারটাই জানতে চাই তোমার কাছে। ধরো যদি দু'চারটে ফ্যান্সি কার তৈরি করা যায় তাহলে কেমন হয়?

গাড়ির ইঞ্জিন তো বাজার থেকেই কিনতে হবে। ইঞ্জিন তৈরি করা তো সহজ নয়।

তা বটে। যদি পুরানো গাড়ি কিনে সেটা রিমডেলিং করা যায়?

সেটা হতে পারে।

ইঞ্জিনকে ফুয়েল এফিসিয়েন্ট আর ফুলপ্রুফ করার কাজটা যদি করা যায়, তাহলে পারবে সেটা?

অমিত মাথা চুলকে বলল, এসব অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াররা বলতে পারবে। আমি সামান্য মেকানিক।

আমার তো ধারণা ছিল মেকানিকদেরই অভিজ্ঞতা বেশি।

আমরা চালু মডেলগুলো চিনি। মেরামতও পারি। কিন্তু ইঞ্জিন রিমডেলিং করা অন্য ব্যাপার।

একটু হতাশ হয়ে রামমোহন বললেন, তুমি তাহলে পারবে না।

মনে হচ্ছে পারব না।

রামমোহন শূন্য দৃষ্টিতে সামনের বিশাল জমিটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আমার খুব শখ ছিল অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি করি। সেটা সম্ভব নয় বলে নতুন একটা ভেনচারে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

অমিত লজ্জিতভাবে চুপ করে রইল।

আরও একটু ভেবে দেখ।

ভাবব, তবে কাজটা কঠিন হবে।

রামমোহন আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, চলো, ফেরা যাক।

ফেরার পথে রামমোহন একটিও কথা বললেন না। অমিত মনে মনে খুব দমে গেল। সে বুঝতে পারছিল, গ্যারেজটা হবে না। আর গ্যারেজ না হলে চাকরিও তার হওয়ার নয়।

রামমোহনবাবুর বাড়ির আউট হাউসে তার থাকার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ঘরে একখানা নেয়ারের খাটিয়ায় চাদর পাতা। কম্বল অমিতের সঙ্গেই ছিল। ব্যাকপ্যাকে সব রকম ব্যবস্থাই থাকে। কিন্তু রামমোহনবাবুর অতিথি হয়ে আর থাকার কোনও মানেই খুঁজে পাচ্ছে না সে। চাকরির নিশ্চয়তা না থাকলে এখানে পড়ে থেকে অন্যের অন্ন ধ্বংস করে লাভ কি?

গভীর রাত অবধি জেগে থেকে সে অনেক ভাবল। তারপর ঘুমোলো। ঠিক করল, পরদিনই এক ফাঁকে কাউকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকে চলে যাবে।

অসুখ সেরে যাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে তার আদর-যত্ন কিছু কমেছে। আউট হাউসের অন্যান্য ঘরে রামমোহনের এস্টেটের অনেক কর্মচারি থাকে। তাদের জন্য ঢালাও একটা ব্যবস্থা আছে। সকালে পাউরুটি আর কলা, দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারি, রাতে রুটি আর একটা তরকারি। ঘরে ঘরে এসে কাজের লোকেরা পৌঁছে দিয়ে যায়।

সকালে অমিত যখন তার জলখাবার শেষ করে চা খাচ্ছিল তখন স্বপন বণিক এসে দরজায় দাঁড়াল।

এই যে অমিতবাবু, কী খবর?

অমিত একটু তটস্থ হয়ে বলল, ভালই।

স্বপন একটু ফিচেল হাসি হেসে বলল, কি রকম ভাল?

মোটামুটি।

গ্যারেজের চাকরির কি হলো?

কাঁচুমাচু হয়ে অমিত বলল, বোধহয় হবে না।

হবে না! হবে না কেন?

অমিত দুঃখিত মুখে বলল, উনি যা চাইছেন তা অনেক বড় ব্যাপার। আমি তো সামান্য মেকানিক। ওসব আমার সাধ্যের বাইরে।

তাহলে কী করবেন? ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন?

আজ্ঞে।

রামমোহনবাবুকে তাহলে জপাতে পারলেন না?

জপাতে চাইনি তো!

ওই হলো। যাক গে, চা-টা খেয়ে একটু ওপরে আসুন।

ওপরে?

হ্যাঁ। মলয়দা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কিন্তু উনি যে আমাকে চেনেন না।

চিনতে চাইছেন। ভয় পাচ্ছেন কেন?

না, এমনি ভাবছিলাম, আমাকে দিয়ে ওঁর কী দরকার থাকতে পারে?

সেটা ওঁর কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন।

আচ্ছা যাচ্ছি।

অমিত খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল স্বপন চলে যাওয়ার পর। মলয়দা ডাকছেন কেন?

সে নিজে মোটর মেকানিক হলেও তার অনেক ভদ্রলোক বন্ধু আছে। কিন্তু বন্ধুত্ব সমানে সমানে নয়। ওরা টের পায় না। কিন্তু সে টের পায় ভদ্রলোক বন্ধুদের সঙ্গে তার একটু গ্যাপ থেকে যায়। হীনমন্যতা হবে। এ বাড়িতে এসে সেই হীনমন্যতাটা সে খুব বেশি টের পাচ্ছে।

একটু বাদে একটু অস্বস্তি নিয়ে সে সব সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। এ আউটহাউসে মলয়বাবু কেন থাকেন সেটা একটা রহস্য। অত বড় বাড়ি থাকতে আমলা-কর্মচারিদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে উনি আছেন কেন? বাবার ওপর অভিমানে, নাকি অন্য কোনও কারণ? বোধহয় সৎমায়ের সঙ্গে থাকতে চান না। কে জানে কি!

দোতলায় উঠতেই স্বপন বণিকের সঙ্গে দেখা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার জন্যই বোধহয়।

আরে আসুন, এদিকে। বলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। দোতলাটা বোধহয় ফাঁকাই থাকে। দুটো ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরের পর্দা ঠেলে স্বপন ভিতরে ঢুকে পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে বলল, আসুন।

ভিতরে সোফাসেট সাজানো, একধারে ডিভান, অন্যধারে একটা টিভি সেট, একটা দামী স্টিরিও আর অনেক বই দেখতে পেল অমিত। একখানা সিঙ্গল সোফায় মলয় বসে, পরনে পাজামা আর একটা সাদা টি-শার্ট। কফি বা চা খাচ্ছিল। এক হাতে ধরা একটা ইংরেজি খবরের কাগজ।

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে তার চোখে সোজাসুজি তাকায় মলয়। ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মলয় খবরের কাগজটা রেখে বেশ শান্ত ভদ্র গলায় বলল, বসুন।

খুব সংকোচের সঙ্গে বসল অমিত।

মলয় দু'চুমুক কফি খেল। তারপর স্বপনকে চোখের একটা আলতো ইশারা করতেই সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

মলয় হেলান দিয়ে বসে দু'টো হাত থুতনি বরাবর জড়ো করে তার দিকে চেয়ে বলল, আপনার পরিচয় আমি খানিকটা জানি। আর খানিকটা অনুমান করে নিতে পারছি। আপনি মোটর মেকানিক, বেহালার দিকে কোথাও থাকেন এবং আপনি সুভদ্রর বন্ধু। ঠিক তো!

যে আজ্ঞে।

এখানে এসে আপনার অসুখ করে এবং আপনার অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া হয়নি।

আজ্ঞে।

আপনার বোধহয় আপনজন কেউ নেই, না?

আজ্ঞে না।

বাবা আপনাকে দিয়ে একটা মেগা মোটর গ্যারেজ চালাতে চাইছেন। তাই তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে সেটা বোধহয় হবে না।

আমি সে ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নই। উনি ওঁর টাকা ইচ্ছে করলে জলেও ফেলে দিতে পারেন। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমার একটা কৌতূহল, আপনি যে ঘরে প্রথম রাত কাটিয়েছেন সেই ঘরে ওই রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আপনি বা আপনার বন্ধুরা কি তা জানেন?

কি ঘটনা?

ওই ঘরে একটা স্টিলের আলমারি থেকে আমার মায়ের অর্থাৎ আসল মায়ের কয়েকটা জিনিস চুরি যায়।

ও।

আপনি কি কিছু জানেন?

অমিত একটু ভাবল। তারপর ভাবল যা ঘটেছে তা বলে দিলে তার তো কোনও ক্ষতি নেই। গোপন করে লাভই বা কি? সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, চুরি কিনা জানি না। তবে জ্বরের ঘোরের মধ্যেও আমি দেখেছিলাম একজন বয়স্কা সুন্দরী মহিলা আমাদের ঘরে ঢুকে একটা স্টিলের আলমারি খুলে কিছু বের করে নিয়ে গেলেন।

মলয় তার দিকে প্রায় পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলে, ঠিক দেখেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অন্য কেউ নয়?

না।

ঘটনাটার কথা কাকে কাকে বলেছেন?

কাউকে না।

মনে করে দেখুন।

পুলিশকে বলিনি।

সুপর্ণাকে?

অমিত একটু ভাবল। তারপর বলল, বোধহয় বলেছি। ঠিক মনে নেই। রিনি দেবী খুন হওয়ার খবর পেয়ে একটু নার্ভাস হয়ে যাই। তখন ঠিক নিজের ওপর রাশ ছিল না।

মলয় দুটো চোখ একটু বুজে রইল। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে তার দিকে চেয়ে বলল, সুপর্ণার সঙ্গে আপনার ভাব কেমন?

অমিত একটু হেসে বলল, ভাব বলতে আলাপ আছে। উনি নার্সিং করতেন তো।

কোনও সফট ব্যাপার ঘটেনি তো?

ছিঃ ছিঃ! আমি অতি সামান্য মানুষ।

মলয় তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

এ জায়গাটা ছাড়তে হবে। আর সেই রাতে যে ঘটনাটা আপনি দেখেছেন সেটা ভুলে যেতে হবে।

ভুলে যাবো?

ঠিক ভুলতেও হবে না, ঘটনাটা অন্যভাবে সাজাতে হবে।

কি রকমভাবে?

আপনি কোনও বয়স্কা মহিলাকে দেখেননি। দেখেছেন একজন অল্পবয়সী মেয়েকে। যে সুন্দরী নয়, অতি সাধারণ।

অমিত অস্বস্তিতে পড়ে বলল, কেন?

মলয় এবার খুব ধীর গলায় বলল, যা বলছি তাই সত্যি কথা। সে রাতে কোনও বয়স্কা মহিলা ও ঘরে ঢোকেনি। যে ঢুকেছে সে অল্প বয়সী। জ্বরের ঘোরে আপনি ভুল দেখেছেন। ঘরে কি জোরালো লাইট ছিল?

না। একটা ডিম সবুজ বা নীল আলো ছিল।

তাহলে তো ভুল দেখাই স্বাভাবিক। তাই না?

অমিত একটু ভাবল। তারপর বলল, আমার চোখ খুব ভাল।

আপনার তখন একশ' চার-পাঁচ জ্বর ছিল। আই সাইট জ্বরের ঘোরে নানা রকম উল্টোপাল্টা দেখায়।

আমি কি আবার ঘটনাটা ভেবে দেখব?

নিশ্চয়ই। তবে আমি যেমন বলছি তেমন করেই ভাববেন। অন্যভাবে নয়।

অমিত কী বলবে ভেবে পেল না।

বর্ধমানে পড়ে থাকার আর মানে হয় না। অমিতের আর ভালও লাগছে না। সে তার ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল। সাইকেলটা আছে। বর্ধমান থেকে কলকাতায় সাইকেলে ফিরতে দুর্বল শরীরে একটু কষ্ট হবে তার। তা হোক, কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে পেরে যাবে। খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়লে সন্ধ্যার মুখে পৌঁছে যেতে পারবে। নিজের ঠেক-এ ফিরে যাওয়াই ভাল। এখানে তার কোনও কাজ নেই, উপরন্তু সে একটা অলক্ষ্য ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ছে।

বিকেলে সে তার সাইকেলটা পরীক্ষা করে দেখছিল। পিছনের চাকায় হাওয়া নেই। হাওয়া দিয়ে নিতে হবে।

সাইকেলটা ভাল জাতের। অমিত নিজের জমানো টাকায় কিনেছে। যে কাজে কিনেছে সে কাজটা হল না অবশ্য, বন্ধুরা কতদূর এগিয়ে গেছে।

রামমোহনবাবুর খাস চাকর নবীন এসে বলল, বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন। জরুরী দরকার। এক্ষুণি আসুন।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বোধহয় গ্যারেজের কথাই বলবেন। লাভ নেই, ও গ্যারেজ হবে না। রামমোহনবাবু গ্যারেজের বকলমে কার ম্যানুফ্যাকচারিং করতে চাইছেন।

সে উঠল।

রামমোহনবাবু দোতলায় তার কাজের ঘরেই বসে ছিলেন। স্টেনোগ্রাফার একটা মেয়ে ডিকটেশন নিচ্ছে। অমিতকে বসতে বলে ডিকটেশন শেষ করলেন। তারপর মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে অমিতের দিকে ফিরে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।

তোমরা যেদিন এ বাড়িতে এলে সেদিন রাতে তোমাদের ঘরে কে ঢুকেছিল জানো?

একথা আপনাকে কে বলল?

কেউ বলেছে। মহিলাকে দেখেছো তো?

অমিত ফাঁপরে পড়ে গেল। আজই মলয় তাকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছে যেন মহিলার কথা সে না বলে। এখন কি করবে অমিত? সে আমতা আমতা করে বলল, জ্বরের ঘোরে কাকে যে দেখেছি ভাল বুঝতে পারিনি। ঘরে তো জোরালো আলো ছিল না।

কিন্তু তুমি নাকি সুপর্ণাকে বলেছো একজন বয়স্কা সুন্দর মতো মহিলাকে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে কিছু বের করে নিতে দেখেছো।

অমিত একটু দ্বিধায় পড়ে বলল, বলেছিলাম, কিন্তু আমার একটু সংশয় আছে।

ব্যাপারটা খুলে বলো। ঘটনাটা ভীষণ জরুরী।

অমিত হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন জরুরী বলবেন?

রামমোহন প্রশ্ন শুনে হয়তো বিরক্ত হলেন, কিন্তু ধমক-টমক করলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, পারিবারিক কেচ্ছার কথা প্রকাশ যত না হয় ততই ভাল। কিন্তু বোধহয় এখন সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তোমাকে দেখে বিশ্বাসী লোক বলে মনে হয়, পারবে কথাগুলো গোপন রাখতে?

পারব।

যে মহিলা ঘরে ঢুকেছিলেন বলে তুমি বলেছো, তিনি রিনির মা। মহিলা খুব ভাল মানুষ ছিলেন না। রিনিকে বিয়ে করতে তিনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন। ব্ল্যাকমেল। ওরা যেদিন পালিয়ে যান সেদিন আমার আলমারি থেকে যা নিয়ে গেছেন তা হল- দুটো কোল্ড স্টোরেজের মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র। আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল সেগুলো রিনির নামে ট্রান্সফার করতে। তবে ট্রান্সফার কাগজপত্রে হলেও বাস্তবে হয়নি। কাগজ আমার হেফাজতেই ছিল। আমার শর্ত ছিল রিনি কাগজপত্র পাবে আমার সত্তর বছর বয়স হলে। তার আগে নয়।

কোল্ড স্টোরেজ আপনি ওকে দিলেন কেন?

বলেছি তো, ব্ল্যাকমেল। আমার কিছু করার ছিল না।

ওঃ।

কিন্তু রিনি অপেক্ষা করেনি, পালিয়ে গিয়েছিল। কাগজপত্রগুলো চুরি করেছিল ওর মা। ফলে আমার চার কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়ে যায়। বুঝেছো?

বুঝেছি।

পুলিশ আমাকে রিনির খুনের দায়ে অ্যারেস্ট করতে পারে। কারণ কি জানো?

কী?

যে রাতে রিনি খুন হয় সেই রাতে ওই কাগজপত্র নিয়ে সে উকিলের বাড়ি যাচ্ছিল। কিভাবে কোল্ড স্টোরেজের পজেশন নিতে হবে তা জানতে। কিন্তু পথেই সে খুন হয়।

আর কাগজপত্র?

সেগুলো তার কাছে পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহটা আমার ওপর বর্তাবে।

কিন্তু কোর্টে এবং অফিসে তো কাগজপত্রের রেকর্ড থাকার কথা।

রামমোহন একটু হাসলেন। তারপর বললেন, রিনি আর তার বাঈজী মা যদি আমাকে ঘোল খাওয়াতে পারত তাহলে আমি এতবড় ব্যবসা করতে পারতাম কি? না হে, কাগজপত্র তৈরি হয়েছিল ঠিকই, আবার পরে চোরাপথে সব রেকর্ড পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে ভাবছেন কেন?

কেন যে ভাবছি তার কারণ গভীর। তুমি কি বুঝবে?

যদি বলতে না চান–

বলছি। রিনির বয়স পঁচিশ। একটু ব্যাভিচারী ভাব তার রক্তেই আছে। সুতরাং আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা তার নয়। সে ছিলও না। কিন্তু যার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছিল সে আমারই ছেলে মলয়।

একটু শিহরিত হলো অমিত।

ঘেন্না হলো নাকি তোমার? জীবনে এরচেয়েও অদ্ভুত ঘটনা কত ঘটে।

আপনি জানতেন?

জানতাম। তবে গা করিনি। করে কী লাভ? পয়সা রোজগারের আনন্দে ডুবে ছিলাম। কিন্তু এখন সমস্যা হলো কেউ আমাকে রিনির খুনের ব্যাপারে ফাঁসাতে চাইছে।

কিভাবে?

কাহিনী অনেক জটিল। বুঝতে পারবে?

তা তো জানি না।

সুপর্ণাকে তো চেনো!

চিনি। উনি খুব ভাল মেয়ে।

সুপর্ণা আমার খুব বিশ্বাসী কর্মচারি। লোকে তাকে-আমাকে জড়িয়ে অনেক রোমান্স গল্প করে থাকে।

অমিত ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে বলল, তাই বুঝি?

ওসব রটনা। আমি কোনও মেয়েকে চাইলে পেতেই পারি। সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু সকলকেই ভোগ করতে হবে এত ভোগী আমি নই।

তারপর?

কেউ রটাচ্ছে আলমারি থেকে কাগজপত্র সরিয়েছে সুপর্ণা, আমার এজেন্ট হয়ে। আরও রটাচ্ছে, সেই রাতে রিনি আর তার মাকে এই বাড়ি থেকে আমিই সরিয়ে দিই এবং অন্য কোথাও আটকে রাখি। কয়েক দিন বাদে রিনিকে খুন করিয়ে– যাকগে, এ মস্ত গল্প। কিন্তু পুলিশ আমার পেছনে লেগেছে।

আমাকে আপনি কি করতে বলেন?

আমাকে বিশ্বাস করতে বলি। শোনো, আজ বা কাল সকালে আমাকে পুলিশ তুলে নেবে। তারপর কী ঘটবে আমি জানি না। হ্যারাস করবে কিছুদিন। কিন্তু ফলস কেসে আমাকে কনভিক্ট করা সম্ভব নয়। আমার ভাল উকিল আছে। কিন্তু কিছুদিন আমাকে জামিন ওরা দেবে না। কারণ কেসটা খুব স্ট্রং। যা হওয়ার এই ফাঁকে হবে।

কী হবে?

আরও একটা খুন এবং সম্পত্তির নয়-ছয়।

কে খুন হবে?

সম্ভবতঃ সুপর্ণা।

কেন?

কারণ আছে। অনেক কারণ। আপাতত তোমাকে একটা কাজ করতে বলি।

কী কাজ?

তুমি বোধহয় কলকাতায় ফিরে যেতে চাও, তাই না?

হ্যাঁ। আমার এখানে কোনও কাজ নেই।

শোনো, তুমি ভেবো না যে গ্যারেজটা আপাতত হবে না বলে তোমাকে আমি ঝেড়ে ফেলছি। তা নয়। বরং তোমাকে আমি মাস মাইনেয় বহাল করছি আজ থেকে। ম্যানেজার নন্দীকে সব বলা আছে। কিন্তু তোমার কাজটা হলো সুপর্ণাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমি!

তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাছাড়া তোমার ওপর সন্দেহটা কম হবে।

পালাতে হবে?

হ্যাঁ। খুব সাবধানে। পারবে?

কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবো ওকে?

কলকাতার একটা ঠিকানা দিচ্ছি। একটা ফ্ল্যাট। সুপর্ণা সেখানে থাকতে পারবে। তুমি ওর খোঁজ-খবর নেবে নিয়মিত। মাসখানেক বাদে এসে আমার খবর নিও। ততদিনে আমি হয়তো জামিন পেয়ে যাবো।

কবে যেতে হবে আমাকে?

আজই।

ট্রেনে?

না। সাইকেলে।

সে কী?

রামমোহন হাসলেন, সুপর্ণা সাইকেল চালাতে পারে।

কিন্তু রাতে?

না। রাতে তোমরা বর্ধমান ছাড়বে। মাইল পাঁচেক দূরে আমার একটা খামার আছে। সেখানে আমার বিশ্বাসী লোক আছে। রাতটা কাটিয়ে ভোর বেলা বেরিয়ে পড়বে। তখন সাইকেলে নয়, বাসটাস ধরবে।

অমিতকে চুপ করে থাকতে দেখে রামমোহন বললেন, পারবে না?

আমি ভাবছি সুপর্ণা তো অ্যাডাল্ট। আমাকে সঙ্গে দিচ্ছেন কেন?

যদি রাস্তায় বিপদ ঘটে?

ওঃ।

পারবে?

পারব। কিছু শক্ত কাজ নয়।

কাজটা শক্তই হয়ে দাঁড়াল শেষ অবধি। কে জানে কেন, সন্ধ্যার পর থেকে মলয়ের ঘরে অনেক লোকজনের আনাগোনা শুরু হল। স্বপন এসে থানা গাড়ল তার ঘরে। আবোলতাবোল কথা।

ওদিকে বড় বাড়ির পেছনে রাত ন'টা নাগাদ সুপর্ণা তৈরি থাকবে। রামমোহন বলে দিয়েছেন।

স্বপন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে! কেন বলুন তো!

আমি একটু বাজারে যাবো।

ও। তা যান না।

অমিত বুঝতে পারল জিনিসপত্র সাইকেলে চাপিয়ে বেরনোর বাসনা ত্যাগ করতে হবে। এগুলো পড়েই থাক। বরং তাতে সন্দেহ কম হবে।

অমিত উঠে পড়ল। বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। আপনি বসুন।

অমিত সাইকেল নিয়ে সদর দিয়ে বেরোলো। তারপর অনেকটা ঘুরে পিছনের ফটকে। সুপর্ণা তখনও আসেনি। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর এল। নিঃশব্দে।

চলুন।

চলুন।

বর্ধমান ছেড়ে জিটি রোড ধরে সাইকেল চালিয়ে হু হু করে দূরত্বটা পেরিয়ে গেল তারা। তারপর সুপর্ণাই পথ দেখিয়ে বড় রাস্তা থেকে ডান ধারে মোড় নিল। মাইল খানেক বাদে খামারবাড়ি।

সুপর্ণা এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। মুখ গম্ভীর। খামারবাড়িতে ঢুকে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে এল। তারপর বলল, অ্যাডভেঞ্চার কেমন হচ্ছে?

ভালই তো।

সুপর্ণা একটু হাসল, শুনলাম চাকরি পেয়েছেন।

আমিও তাই শুনেছি।

এখন আর সামান্য মোটর মেকানিক বলে নিজের ওপর ঘেন্না নেই তো!

বুঝতে পারছি না। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে দেবেন?

তাড়া কিসের? সময় আছে। বুঝিয়ে দেবো।

খামার বাড়িটা যে চমকপ্রদ তা নয়। তবে ঘের পাচিলে ঘেরা অনেকখানি জমি নিয়ে একটা বেশ জম্পেশ ব্যাপার। ভিতরে মস্ত পুকুর আছে, ক্ষেত আছে, প্রচুর গাছপালাও আছে। মাঝখানে, পুকুরের উত্তর ধারে ট্যালির ছাউনিওয়ালা বেশ বড়সড় একখানা বাংলো বাড়ি। খুব আলো টালো চলছে।

ফটকের দারোয়ান তাদের দেখেই গেট খুলে দিল। বলল, বর্ধমান থেকে আসছেন তো! ভিতরে যান, ভজুদা অপেক্ষা করছেন।

সাইকেল চালিয়েই তারা ভিতরের রাস্তা পেরিয়ে বাংলোবাড়ির সামনে গিয়ে নামল।

একটা চাকরগোছের লোক এগিয়ে এসে বলল, সাইকেল এখানে থাকুক, আমি সরিয়ে রাখলাম। আপনারা ভিতরে যান। ভজুদা সামনের ঘরেই আছেন।

ভজুদা কে তা তারা জানে না। পাঁচ ধাপ সিঁড়ি এবং চওড়া লাল সিমেন্টে বাঁধানো বারান্দা পেরিয়ে সামনে সুপর্ণা আর তার পেছনে অমিত ঘরে ঢুকল। অমিত ভারী জড়োসড়ো, সংকুচিত, অপ্রতিভ। যে ঘটনার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে তার সঙ্গে তার নিজের জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। তার জীবনে অচেনা মানুষজন, অচেনা বাড়িঘর, অচেনা ঘটনা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে।

সামনের ঘরখানা দৃশ্যতই বসবার ঘর। মোটা মোটা সোফাসেট দিয়ে সাজানো। টিভি সেট আছে, নানারকম আলোর স্ট্যান্ড আছে, ঝাড়বাতি আছে, শোকেসে বিস্তর দ্রষ্টব্য দখলদারী জিনিস সাজানো আছে। বাঁকড়োর ঘোড়া, মহেঞ্জোদারোর পুতুলের নকল, মুখোশ, পেতলের মোমদান, গণেশ মাথা, বিলিতি পুতুল।

তারা ঘরে ঢুকতেই বাঁ ধারের সোফায় বসা কালো আর রোগা চেহারার একজন লোককে দেখতে পেল। কর্ডলেস ফোনে কার সঙ্গে যেন ভ্রু কুঁচকে কথা বলছে। হাতের ইশারায় তাদের বসতে ইঙ্গিত করল।

ভারী জড়োসড়ো হয়ে বসল অমিত। সুপর্ণা তার মতো এত কুঁকড়ে নেই। বেশ সাহসী মেয়ে। কতটা সাইকেল চালিয়ে এল, তবু তেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। মুখেও তেমন উদ্বেগের ছাপ নেই।

ভজুদা নামক ব্যক্তিটির চেহারায় তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কালো, রোগা, নিরীহ চেহারা, পরনে একটা পাতলুন, গায়ে উলিকটের গেঞ্জি আর বেশ বাহারী একটা সোয়েটার। মাথার চুল বেশ পাতলা। ক'দিন পরেই টাক পড়ে যাবে। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হবে।

ভজুদা টেলিফোনে কাকে যেন বলছিল, এসব কথা এখন বেশি প্রচার না হওয়াই ভাল।... হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা পৌঁছে গেছে। ... একটু খোঁজখবর নাও। যে পেট্রোল পাম্পে তেল নেয় সেখানে লোক পাঠিয়ে জেনে নাও আজ তেল ভরেছে কিনা। ভরলে কখন এবং কত লিটার। আর কোনো ওর ঘরে যে কাজ করে তাকেও একটু জিজ্ঞেস কোরো কোনও কথাবার্তা ওভার হিয়ার করেছে কিনা। ... ঠিক আছে, ছাড়ছি। দরকার মতো ফোন কোরো।

ভজুদার মুখটা প্রসন্ন নয়। ফোনটা বন্ধ করে তাদের দিকে চেয়ে বলল, তোমরাই তো অমিত আর সুপর্ণা?

দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ।

তোমাদের বোধহয় এখানে থাকা নিরাপদ হবে না।

সুপর্ণা বলল, কেন, মলয়দা টের পেয়েছে?

টের না পেলেও সন্দেহ করছে বোধহয়। গাড়ি আর দলবল নিয়ে একটু আগেই বেরিয়েছে। অমিত, তুমি কি বেরোবার সময়ে স্বপনকে কিছু বলেছো?

বলেছি, বাজার থেকে ঘুরে আসছি।

স্বপন ভয়ঙ্কর চালাক। ওই তো মলয়কে চালায়।

সুপর্ণা বলল, আমাদের কি ফের পালাতে হবে?

ভজুদা চিন্তিত মুখে বলে, পালাবে কি করে? এখন রাত হয়ে গেছে, বাস-টাসে উঠে পালাতে চেষ্টা করলে পারবে না। ওরা দরকার হলে বাসের রাস্তা আটকে উঠে সার্চ করবে। ষন্ডাগুণ্ডাদের অসাধ্য কি আছে? সাইকেলের তো আরও ভরসা নেই। ভাবছি কি করা যায়।

সুপর্ণা বলল, আমরা যে এখানেই আসব তা কি ওরা জানে?

অবভিয়াস চয়েস। দুইয়ে দুইয়ে চার করতে দেরী হবে না।

অমিত বলল, কিন্তু মলয়বাবু কী চাইছেন?

ওর মাথায় নানা দুষ্টবুদ্ধি কাজ করে। কী চাইছে তা জানি না। তবে আপাতত তোমাদের পালানোটা বন্ধ করতে চাইছে।

উনি কি এখানে আসছেন?

তাই তো মনে হচ্ছে। এখন তোমাদের নিয়ে কি করি সেইটিই চিন্তা। রামমোহনবাবু অ্যাজ এক্সপেকটেট, পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আধঘন্টা আগে এসে নিয়ে গেছে। আজ জামিন পাওয়ার আশা নেই। কাল কোর্ট খুললে পিটিশন পেশ করা হবে। কিন্তু জামিন পাওয়া শক্ত হবে। উনি বাইরে থাকলে একটা উপায় হত। তোমাদের সাইকেল দুটো কোথায়?

সুপর্ণা বলল, বাইরেই রয়েছে। একটা লোক বলল সরিয়ে রাখবে।

তোমরা কি খুব টায়ার্ড?

সুপর্ণা বলল, আমি টায়ার্ড নই। তবে অমিত বাবু সদ্য একটা বড় অসুখ থেকে উঠেছেন। ওর টায়ার্ড হওয়ারই কথা।

অমিত বলল, না না আমিও তেমন টায়ার্ড নই। কি করতে হবে বলুন।

এ জায়গায় তোমাদের রাখা নিরাপদ নয়। রাস্তা ঘাটেও নিশ্চয়ই লোকে তোমাদের দেখেছে। একজন পুরুষ মানুষ সাইকেল চালিয়ে গেলে লোকে খেয়াল করে না। কিন্তু তোমরা দু'টি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে সাইকেলে আসছিলে, সুতরাং লোকে তোমাদের লক্ষ্য করেছে। কাজেই তোমাদের গা ঢাকা দেওয়া দরকার।

অমিত একটু ভেবে বলল, আপনার এখানে কতজন লোক আছে?

কেন বলো তো! এখানে যারা আছে তারা সবাই বিশ্বাসী।

বিশ্বাসের কথা নয়। তারা সংখ্যায় কতজন?

এ বাড়ির বাগানের কাজ করে তিনজন। আর গরু সামলায় তিনজন। ঘরের কাজ করার জন্য দু'জন আছে। রান্নার লোকও দু'জন। আর যদি আমাকে ধরো তাহলে এগারোজন। লোক দিয়ে কি হবে বলো তো!

ভাবছি, মলয়বাবু কতজন লোক নিয়ে আসবে। তারা যদি হামলা করে তবে তার মোকাবিলা করা যাবে কি-না।

পাগল হয়েছো? মলয় রামমোহনবাবুর ছেলে, এ বাড়িরও মালিক, ভবিষ্যৎ মালিক তো বটেই। তার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? তাছাড়া ওর দল মানে তো গুণ্ডার দল।

অমিত বলল, আমি ও রকমভাবে ভাবিনি, আপনি ঠিকই বলেছেন। এখান থেকে রেল স্টেশন কি খুব দূরে?

সেটাই ভাবছিলাম, ট্রেনে উঠে পড়লে একরকম নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ওরা যদি সেটাও খেয়াল রাখে তাহলে তোমাদের বিপদ হবে।

সুপর্ণা হঠাৎ বলল, আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?

কি কাজ?

আমরা যদি ফের বর্ধমানেই ফিরে যাই? মলয়বাবু তো ধরেই নিয়েছেন আমরা বর্ধমান ছেড়ে পালাচ্ছি, তাই না? কিন্তু আমরা বর্ধমানেই ফিরে যাবো এটা নিশ্চয়ই তিনি ভাববেন না।

ভজুদা বললেন, প্ল্যানটা খারাপ নয়। কিন্তু রিস্ক থাকছে। বর্ধমানে কিছু কিছু লোকতো তোমাদের দেখবেই। তারা বলে দিলে ধরা পড়তে কতক্ষণ?

অমিত বলল, না, আমার মাথা কাজ করছে না।

সুপর্ণা বলল, আমারও না।

ভজুদা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, একটাই ভয়। খবর পেলাম, অমিতের ওপর মলয় খুব রেগে আছে। মলয় বোধহয় তোমাকে পুলিশের কাছে একটা স্টেটমেন্ট দিতে বলেছিল?

হ্যাঁ, সুপর্ণার বিরুদ্ধে।

জানি। রামমোহনবাবু বলেছেন আমাকে। সেটা দাওনি বলেই মলয়ের রাগ।

সুপর্ণা ভ্রু কুঁচকে বলল, আমার বিরুদ্ধে কিসের স্টেটমেন্ট?

ভজুদা বললেন, আলমারি থেকে দলিলপত্র সরানোর অভিযোগ। মলয় ইমম্যাচিওর বলেই ওরকম স্টেটমেন্ট দিতে বলেছে। কিন্তু ওই রাতে সুপর্ণা যে বাড়িতে গিয়েছিল সেটা কি করে প্রমাণ হবে তা ভেবে দেখেনি। যাকগে, তোমাদের হাতে বেশি সময় নেই। আপাতত একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করছি। খামারবাড়ির পিছনে দোলমঞ্চের গায়ে সতীশ চাটুজ্জের বাড়ি। খুব ধার্মিক লোক। বাড়িখানা বেশ বড়সড়। তোমরা আজ রাত্তিরটা ওই বাড়িতে থাকো। মলয় সতীশ চাটুজ্জেকে খুব ভয় পায়।

অমিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন ভয় পায়?

সে কথা পরে শুনো। তবে এটুকু বলে রাখি, এ তল্লাটে সতীশ চাটুজ্জেই হলেন আইন-আদালত। তাঁর কথায় লোকে ওঠে বসে। এখানে তাঁর অনেক যজমান। তাঁর সঙ্গে আমার খুব খাতির। মলয় ওঁর বাড়িতে হানা দেওয়ার সাহস পাবে না। আর দেরী কোরো না। নিতাই তোমাদের পেছনের ফটক দিয়ে নিয়ে যাবে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই তারা দু'জন নিতাই নামক একটি লোকের দেখানো শুঁড়ি পথ ধরে আগাছা জঙ্গল পেরিয়ে একখানা দোতলা বাড়িতে এসে ঢুকল।

সতীশ চাটুজ্জের বয়স বেশি নয়। মধ্য চল্লিশের ছিপছিপে, একটা ক্ষুরধার প্রখরতা আছে। বললেন, ভজুদার আমাকে কোন করেছিল। তা তোমাদের এখানে কোনও ভয় নেই।

সুপর্ণা চলে গেল অন্দরমহলে। অমিতের জায়গা হল ছাদের চিলেকোঠায়।

সতীশ চাটুজ্জে তাদের রাতের খাওয়া খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। বললেন, আমরা তাড়াতাড়ি শুতে যাই। ভোরবেলা উঠতে হয় বলে এই নিয়ম।

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অমিতের কোনও আলাপ হল না। রাত আটটায় তার চিলেকোঠায় ঘরে রুটি ডাল তরকারি নিয়ে একটা লোক এল। অমিত খাওয়ার পর থালাবাটি নিয়ে চলে গেল।

একটা সরু খাটে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। অমিত ক্লান্ত শরীরে শুয়ে টপ করে ঘুমিয়ে পড়ল। এক ঘুমে রাত কাবার করে যখন উঠল, তখন ভোরের আলো ফুটিফুটি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। চারদিকে চাপ বেঁধে আছে কুয়াশা। বিস্তর পাখির ডাক আর ওড়াউড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে গরুতর হাম্বা। আর সেই সঙ্গে সতীশ চাটুজ্জের দোতলা থেকে সুরেলা ভজন গানের ধ্বনি।

অমিত ছাদে বেরিয়ে চারদিকটা দেখল। কিছুই দেখার উপায় নেই অবশ্য। কুয়াশা এত ঘন যে নিজের করতলই ভাল করে দেখার উপায় নেই। রেনপাইপের জালিতে ছোট কাজটা সেরে নিয়ে সে ফের ঘরে এসে বল সঙ্গে কিছুই আনতে পারেনি সে। টুথপেস্ট বা ব্রাশ অবধি নয়। অবশ্য তার সঞ্চয়ের কয়েক হাজার টাকা তার সঙ্গে আছে। আরও কয়েক হাজার আছে কলকাতার ব্যাংকে। তার কোন শখ শৌখিনতা বা নেশা নেই বলেই যা হোক কিছু জমেছে।

ছ'টার কিছু বাদে সতীশ চাটুজ্জে নিজেই উপরে এলেন।

তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো রাত্রে?

না তো! বেশ ভাল ঘুম হয়েছে।

এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা গেল না। যাই হোক, সকালে ভজু ফোন করেছিল। বলল, কাল নাকি রাত্রি আটটা নাগাদ মলয় আর তার বন্ধুরা তোমাদের খোঁজে এসেছিল। খুব চেঁচামেচি করেছে। তারপর ফিরেও গেছে। তবে মলয় বোকা নয়। তোমরা যদি আজ কলকাতা যেতে চাও তো সাবধানে দেখেশুনে যেও। মলয় অবশ্যই নজর রাখবে। আর স্বপন বলে কে একজন বন্ধু আছে ওর। সে নাকি ওই বাড়িতেই এখনও আছে। কাজেই তোমাদের ও বাড়ি যাওয়া চলবে না।

আমাকে একটা কথা বলবেন?

কি কথা?

মলয় বাবু আপনাকে ভয় পান কেন?

সতীশ চাটুজ্জে একটু হাসলেন। বললেন, ভয় পায় কিনা তা জানি না। তবে বোধহয় ভয়ের চেয়েও বেশি ঘেন্না পায়।

তাই বা কেন?

সে তো অনেক কথা ভাই। তুমি বরং হলঘরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে নাও। তারপর কিছু খাও। টাইফয়েডের পর লোকের খুব খিদে পায়।

অমিত বলল, খিদেটিদে সব মাথায় উঠেছে। এত টেনশনে কি ওসব খেয়াল থাকে?

টেনশনে অনিয়ম করে শরীরের ক্ষতি হলে লাভ কি?

ঠিক আছে, যাচ্ছি।

অমিত নিচে নামল। বাথরুমের কাজকর্ম সেরে সিঁড়ির মুখে আসার সময়ে দেখল, সুপর্ণা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

আপনার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন না।

আমি পালাতে চাই না, বর্ধমানে ফিরে যেতে চাই।

গিয়ে?

যা হওয়ার হবে। আমি থানায় গিয়ে একটা এফআইআর করতে চাই। মলয়দার নামে।

অমিত একটু হেসে বলল, তাতে কোন কাজ হবে কি?

জানি না। কিন্তু পালাতে কেমন যেন ঘেন্না করছে। কোনও দোষ করিনি, অথচ একটা লোকের ভয়ে পালাতে হচ্ছে, এটা আমার ভাল লাগছে না।

বেশ তো, চলুন বর্ধমানেই ফিরে যাই।

না, আপনি যাবেন না। আমি একা যাবো।

তাই হয় নাকি? রামমোহন বাবুকে কথা দিয়েছি, আপনার দেখাশুনা করব।

না, আপনার ওপর মলয়দার রাগ আছে, শুনলেন না?

সে তো আপনার ওপরেও আছে।

কিন্তু আমার ভয় করছে না।

আমারই বা ভয় কিসের? তিন কূলে কেউ নেই, চোখের জল ফলবে না কেউ, আমি তো মুক্ত পুরুষ। চলুন, আমি সঙ্গে যাবো।

আপনার বড্ড সাহস! এতটা ভাল নয়।

বললাম তো, আমার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে তেমন কোনও তফাৎ নেই। আমাকে নিয়ে ভাবছেন কেন?

ভাবাচ্ছেন বলেই ভাবছি। আপনি কলকাতায় নিজের জায়গায় ফিরে যান। তাহলে আপনার কোনও ঝামেলা থাকবে না।

আর আপনি মিথ্যে মামলায় জেল খাটবেন? সেই রাতে যে আমি আপনাকে নয়, রামমোহন বাবুর শাশুড়িকে দেখেছিলাম সেটা আদালতে বলবে কে? আমি যে খুব ইম্পর্টেন্ট সাক্ষী!

আদালত পর্যন্ত গড়াবে না, রামমোহন বাবু কী বলেছিলেন মনে আছে? আমাকে খুন করতে চায় কেউ। উনি অবশ্য ভেঙে বলেননি কে আমাকে খুন করতে চায়।

ভুলিনি। সব মনে আছে। সেইজন্যই আপনাকে একা ফেলে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সহমরণ নাকি?

কী যে বলেন!

দেখুন, আমার জন্য আপনার অত দরদের দরকার নেই। ভাল করে তো পরিচয়ও হয়নি। আর আপনাকে আমি পছন্দও করছি না।

পছন্দ করার প্রশ্ন উঠছে কেন? আমাকে কেউই আজ পর্যন্ত পছন্দ করেনি, অন্ততঃ কোনও মেয়েই নয়। আর করবেই বা কেন বলুন! মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

আছেই তো। আপনি প্লীজ কলকাতায় চলে যান। আমার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

হঠাৎ অমিত একটু চড়া গলায় বলল, শুনুন, আপনি যদি ভেবে থাকেন যে, আপনি খুব সুন্দরী আর আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে হ্যাংলামি করছি, তাহলে ভুল করবেন। আপনার প্রতি আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

অমিতের এরকম রি-অ্যাকশন আশা করেনি সুপর্ণা। বড় বড় স্থির চোখে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, মোটেই তা ভাবিনি।

ভাল। দয়া করে ওসব রোমান্টিক অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করবেন না। আমাকে একটা কাজ দেওয়া হয়েছে, আমি সেটাই করছি।

আপনি কবে থেকে রামমোহন বাবুর এত আজ্ঞাবাহী হলেন?

আপনি আমাকে কতটুকু চেনেন? আমি যখন যার কাজ করি তার প্রতি ফেইথফুল থাকার চেষ্টা করি। আমার মোটর গ্যারেজে গিয়ে যদি খোঁজ করেন তাহলেই বুঝবেন আমি যার নুন খাই তার গুণও গাই।

আমি আপনার প্রোটেকশন চাই না।

না চাইলেও আমাকে আমার কাজ করতে হবে।

আপনার আত্মসম্মানবোধ নেই?

আমার অনেক কিছুই নেই। তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

ঠিক আছে, আপনি যা খুশি করুন। আমি বর্ধমানে ফিরে যাচ্ছি।

যে যার ঘরে চলে গেল। এবং একটু বাদে সুপর্ণা নেমে এসে দেখল, অমিত সদরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। দু'জনেই গম্ভীর। অমিত শুধু বলল, একটু দাঁড়ান। আমি সাইকেল দুটো নিয়ে আসছি।

ও বাড়িতে স্বপন আছে।

থাকলেই বা স্বপন কী করবে?

স্বপন একজন গুণ্ডা।

গুণ্ডাদের ডেরাতেই তো ফিরে যাচ্ছি। একটা স্বপনকে ভয় পেলে চলবে কেন?

তাহলে আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

আসতে পারেন।

স্বপনের সামনে অবশ্য পড়তে হল না তাদের। পেছনে ফটক দিয়ে ঢুকে কিছু দূর এগোতেই একজন সুশীলগোছের লোক ছুটে এসে বলল, কোথায় যাচ্ছেন? যাবেন না। বিপদ আছে।

আমাদের সাইকেল দুটো দরকার।

ঠিক আছে পেছনের ফটকের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। নিয়ে আসছি।

সাইকেল দুটো টেনে নিয়ে এসে লোকটা বলল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড় ন। দেরি করবেন না।

দু'জন গম্ভীর মুখে সাইকেলে উঠে বর্ধমানের দিকে মুখ ঘোরালো।

না, সুপর্ণার আর ভয় করছে না। অমিতেরও না।